একক 5 □ ভূ-ত্বক

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

5.2 ভূ-ত্বক কাকে বলে

5.2.1 ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বক

5.2.2 নিম্ন ভূ-ত্বক

5.2.3 মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক

5.3 ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক

5.4 ভূ-ত্বকের গুরুত্ব—জীবজগতের ভূ-ত্বকের ভূমিকা তথা মানুষ ও ভূ-ত্বকের মধ্যে সম্পর্ক

5.5 সারাংশ

5.6 প্রশ্নাবলী

5.7 উত্তর সংকেত

5.1 প্রস্তাবনা

সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলা গ্রহদের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ পৃথিবীর মত এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ আর কোন গ্রহের নেই। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ পাতলা, শক্ত শিলার আস্তরণে মোড়া। এই আস্তরণকে ভূ-ত্বক বলে। ভূ-ত্বকের নীচে রয়েছে গুরুমণ্ডল। আর গুরুমণ্ডলের নীচে "কোর" বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল বা কেন্দ্রমণ্ডল (Fig. 5.1)। ভূ-ত্বকের ঠিক উপরেই আছে মাটির খুব পাতলা, হালকা আবরণ। তবে পৃথিবীর সর্বত্র মাটির এই আস্তরণ দেখা যায় না। কারণ সুবিশাল সমুদ্র যেখানে ভূ-ত্বকের উপরে জলমণ্ডল তৈরি করেছে, সেখানে মাটির কোন আবরণ নেই। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, এমনকি মানুষের কাছেও ভূ-ত্বকের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, ভূ-ত্বক জল বা স্থলে বসবাসকারী সব প্রাণীকে, উদ্ভিদকে আশ্রয় দেয়। তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পুষ্টি যোগায়। আসলে ভূ-ত্বক আছে বলেই জীবমণ্ডল আছে। তাই এই পৃথিবীতে সকল জীবের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে—এই ধ্রুব সত্যকে স্বীকার করে নিলে, আমাদের উপর এই পৃথিবীকে নিবিড়ভাবে জানার ও বোঝার দায়িত্ব বর্তায়। সে কারণে আমরা এই এককে ভূ-ত্বক ও পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। ইতিপূর্বেই (পর্যায় 1 এর মাধ্যমে) আপনারা পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন।

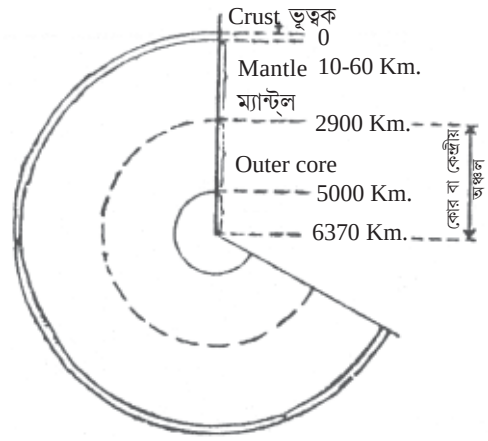

চিত্র 5.1 : *ভূ-ত্বক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন।*

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ভূ-ত্বক কাকে বলে জানতে পারবেন।
- ভূ-ত্বক কি কি দিয়ে তৈরি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভূ-ত্বকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীবজগতের সাথে ভূ-ত্বকের সম্পর্ক নির্দেশ করতে পারবেন।

5.2 ভূ-ত্বক কাকে বলে

ভূ-ত্বক হল ভূ-গোলকের উপরিভাগের কঠিন ও ভঙ্গুর আবরণের (গড়ে প্রায় 35 কিমি পুরু) এক অগভীর শিলাস্তর। এটি গুরুমণ্ডলের উপরে একটি অপেক্ষাকৃত লঘু ঘনত্বের আবরণ। ভূ-ত্বকের নিম্নসীমা "মোহো" বিযুক্তি (Mohorovicic Discontinuity) পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এই মোহো বিযুক্তিকে ভূত্বকের ভিত হিসাবে মনে করা যেতে পারে। ভূ-ত্বকের গভীরতা মহাদেশ ও মহাসাগরের নীচে একরকম নয়। তাই মহাসাগরীয় এলাকায় নীচে ভূ-ত্বকের গভীরতা হল প্রায় 12 কিলোমিটার। অর্থাৎ ভূ-ত্বক কখনই গুরুমণ্ডলের উপরে সমান বা সম গভীরতার আবরণ নয়।

গভীরতা অনুসারে ভূ-ত্বককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বক (Upper Crust) ও নিম্ন ভূ-ত্বক (Lower Crust)। ঊর্ধ্ব ও নিম্ন ভূ-ত্বকের মধ্যে রয়েছে একটি বিযুক্তিতল। এই বিযুক্তি তলটি কনরাড বিযুক্তি (Conrad Discontinuity) নামে পরিচিত। ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা হল প্রায় 10 কিলোমিটার এবং ভূ-ত্বকের প্রায় 25% এই অংশে নিহিত রয়েছে। অন্যদিকে, নিম্ন ভূ-ত্বকের গভীরতা প্রায় 25 কিলোমিটার। ভূ-ত্বকের প্রায় 75% রয়েছে এই নিম্ন ভূ-ত্বক বা "লোয়ার ক্রাস্ট" (Lower Crust) অঞ্চলে। ভূমিরূপ গঠনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বক অঞ্চলে। অর্থাৎ

নদী, বাতাস, সমুদ্র স্রোতের মত প্রাকৃতিক শক্তি ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের নানান ভূমিরূপ গড়ে তোলে।

ভূ-কম্পীয় তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বক গ্রানাইট জাতীয় শিলায় তৈরি। এই ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বককে "সিয়াল" (Sial) বলে। অন্যদিকে, নিম্ন ভূ-ত্বক "সিমা"-র (Sima) অন্তর্ভুক্ত। সিয়াল মূলত ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত হয়েছে।

ভূ-ত্বকের সাথে গুরুমণ্ডলের গঠনগত সম্পর্ক আছে। নীচের ছবিতে ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডলের একটি সহজ প্রস্থচ্ছেদে দেওয়া হল (চিত্র 5.2)।

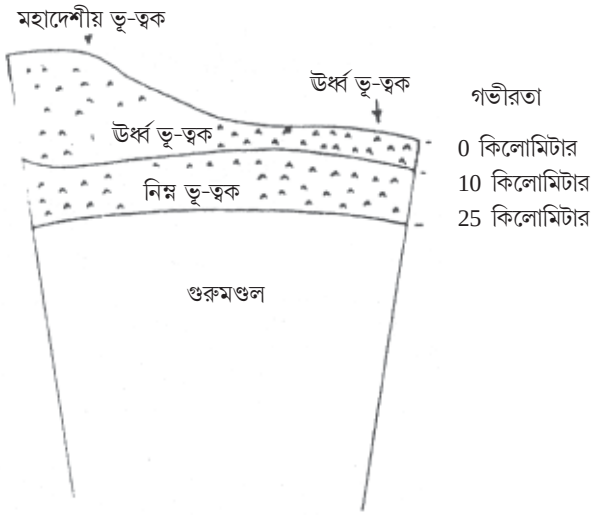

চিত্র 5.2 : *ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডলের প্রস্থচ্ছেদ।*

ভূ-ত্বকের মহাসাগরীয় অংশ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, উচ্চ (Upper), মধ্য (Middle) ও নিম্ন (Lower)। উচ্চ মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের গভীরতা প্রায় 0.3 কিলোমিটার। এটি চুন জাতীয় অবক্ষেপ ও লাল কর্দমে গঠিত (Calcareous sediment and Red Clays)। ভূ-ত্বকের মধ্য অংশটি 1.4 কিলোমিটার গভীর। এবং এখানে মহাসাগরীয় অবক্ষেপ দেখা যায়। এই অংশটি প্রধানত ব্যাসল্ট শিলায় তৈরি। নিম্ন ভূ-ত্বক প্রায় 4.7 কিলোমিটার গভীর এবং মহাসাগরীয় ব্যাসল্ট দিয়ে তৈরি (Oceanic basalt)। মহাসাগরীয় ত্বকের গভীরতা মধ্য-মহাসাগরীয় শিরা-র (Mid Oceanic Ridge) গভীরতার সাথে ভূ-তাত্ত্বিকভাবে সম্পর্কিত।

5.2.1 ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বক (Upper Crust)

ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন মোটামুটি সরল ও সাধারণ প্রকৃতির। ভূবিজ্ঞানীরা ভূ-ত্বকের এই অংশ থেকে শিলার নমুনা (sample) সংগ্রহ করে ভূ-ত্বকের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারেন। তবে "ক্রেটনিক" (Cratonic)* বা স্থায়ী ভূখণ্ড অঞ্চলে শিলার গঠনগত ব্যতিক্রম দেখা যায়। বস্তুত এখানে শিলার গঠন অনেক বেশি জটিল।

*** টীকা ঃ ক্রেটন (Craton) বা স্থায়ী ভূখণ্ড ঃ** প্রাক্-কেম্ব্রীয় কালের সুদৃঢ় শিলামণ্ডলীয় ভূখণ্ডকে স্থায়ী ভূখণ্ড বা ক্রেটন বলে। ভূতাত্ত্বিক কালের প্রায় শুরু থেকে অল্পবিস্তর মোচড় খাওয়া ছাড়া পরবর্তীকালের পর্বতজনির বিশেষ কোন প্রভাব এগুলির ওপর পড়েনি। 11টি প্রধান স্থায়ী ভূখণ্ড অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে।

(দ্রষ্টব্য : ভূবিজ্ঞান কোষ—ড. দীপঙ্কর লাহিড়ী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, 1999।)

ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের গঠন সম্বন্ধে ভূ-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে নফ (Knoff) [1919], ড্যালি (Daly) প্রভৃতি ভূ-বিজ্ঞানীগণ উত্তর আমেরিকার আপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। ক্লার্ক (Clark) [1889] ঊর্ধ্ব-ত্বকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন।

ক্লার্ক এবং ওয়াশিংটন [Clark and Washington, 1924] এর মত অনুসারে ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় অংশের রাসায়নিক গঠন নীচের সারণীতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। তবে সাধারণভাবে ভূ-ত্বক দশটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি, যেমন, অক্সিজেন 46.60%, সিলিকন 27.72%, অ্যালুমিনিয়াম 8.13%, লোহা 5%, ক্যালসিয়াম 3.63%, সোডিয়াম 2.83%, পটাসিয়াম 2.59%, ম্যাগনেসিয়াম 2.09%, টাইটেনিয়াম 0.44%, হাইড্রোজেন 0.14%—অর্থাৎ মোট 99.17% এবং অন্যান্য 0.83%।

অক্সাইড	মহাদেশীয় ভূ-ত্বক: শতকরা ভাগ ওজন অনুসারে	মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক: শতকরা ভাগ ওজন অনুসারে
SiO_2	60.18	49.5
TiO_2	1.06	1.5
Al_2O_3	15.61	16.0
Fe_2O_3	3.14	—
FeO	3.88	10.5 (t)
MgO	3.56	7.7
CaO	5.17	11.3
Na_2O	3.91	2.8
K_2O	3.19	0.15
P_2O_5	0.30	—

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরের সারণীতে মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের যে রাসায়নিক গঠন ও সংযুতির হিসাব তুলে ধরা হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী একমত হননি।

ভূ-ত্বকের মূল উপাদান ও শ্রেণীবিভাগ সহজভাবে

খোলক/মণ্ডলের নাম	গড় গভীরতা কি.মি.	শিলার প্রকৃতি	আপেক্ষিক গুরুত্ব	তাপমাত্রার গড় ভিন্নতা °সে.
ঊর্ধ্ব	0-5	আম্লিক শিলা সাধারণ সিলিকেট পাথর (গ্রানাইট, গ্র্যানোডাইয়োরাইট)	2.90	প্রতি কি.মি. 30° সে. বাড়ে
ভূ-ত্বক	কনরাড	বিযুক্তি/বিচ্ছেদ (গড় ছয় কিমি)		
নিম্ন (অশ্মমণ্ডল)	5-35	ক্ষারকীয় শিলা অলিভিন, ফেলসপার, পাইরোক্সিন সমন্বিত ক্ষারকীয় শিলা (গ্যাব্রো, নোরাইট)	3.00	
	মোহো	বিযুক্তি/বিচ্ছেদ (গড় 35 কিমি)		
ঊর্ধ্ব	200-700	অলিভিন ও পাইরোক্সিন এর ঘন পলিমর্‌ফ	3.3-4.3	100 কিমি গভীরে 1100-1200° সে.
গুরুমণ্ডল		নমনীয় মণ্ডল বা অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ার (সান্দ্র অবস্থায়)		
নিম্ন	700-2900	পেরিক্লেজ (MgO) লোহা-ম্যাগনেসিয়াম (Fe-MgO)	4.4-5.5	400-700 কিমি. গভীরে 1500-1900 সে.
		উইচার্ট-গুটেনবার্গ বিচ্ছেদ		
বহিরস্থি	2900-1500	ধাতব তরল Fe+Ni	5.6-10.00	অস্থি ও গুরুমণ্ডল সীমানায় প্রায় 3000° সে.
কেন্দ্রমণ্ডল		সিলিকন বা সালফাইড বা কার্বাইড বা MgO		বহিরস্থি ও অন্তরস্থি সীমানায় 4300° সে. বেশি গলনযোগ্য পদার্থ তরল অবস্থায়
অন্তরস্থি	5150-6370	ধাতব-কঠিন	10.1-13.6	কম গলনযোগ্য পদার্থ

সারণী **5.1 :** *ভূ-ত্বকের মূল উপাদান ও শ্রেণীবিভাগ সহজভাবে।*

মন্তব্য ঃ অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারের উপরে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত অংশকে অশ্মমণ্ডল (Lithosphere) বলা হয়। অন্যভাবে ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডলের উপরের কিছু অংশ নিয়ে অশ্মমণ্ডল বিস্তৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণায় এই অধিকসান্দ্রতাযুক্ত অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারের উপরেই অশ্মমণ্ডল (প্রায় 10 কিমি) অনেকটা ভাসমান অবস্থায় (সমস্থিতি) বিরাজমান। আবার তিব্বত মালভূমির নীচে অশ্মমণ্ডলের গভীরতা স্থানীয় ক্ষেত্রে গড় গভীরতা (35 কিমি)-র চেয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় 75 কিমি পর্যন্ত।

5.2.2 নিম্ন ভূ-ত্বক (Lower Crust)

এটি ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের নীচে অবস্থিত। তবে নিম্ন ভূ-ত্বক এলাকা থেকে ভূ-তাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করা এখনও ভূতাত্ত্বিকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য স্থানীয়ভাবে যেখানে গ্রানুলাইট (Granulite) গঠিত ত্বক ভূ-পৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে, সেখানকার নমুনা সংগ্রহ করে ভূতাত্ত্বিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নিম্ন ভূ-ত্বকের শিলার প্রকৃতি ও উদ্ভব জটিল ধরনের। সুতরাং নিম্ন ভূ-ত্বক সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত প্রায় সব তথ্যই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে রয়েছে। বস্তুত নিম্ন ভূ-ত্বকের উপাদানগুলি ঊর্ধ্ব ভূ-ত্বকের অবশিষ্ট উপাদান থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

ভূ-কম্পীয় তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডল (Mantle)-এর মধ্যবর্তী এলাকায় একটি "ট্রানজিশনাল জোন" (Transitional Zone) থাকার সম্ভাবনা আছে। নিম্ন ভূ-ত্বকের শিলাসমূহ "মাফিক" (Mafic) চরিত্রের এবং গ্র্যানুলাইট গঠিত এলাকা "সিলিসিক" (Silicic) প্রকৃতির।

আগ্নেয়গিরি থেকে উদগত পদার্থগুলি পরীক্ষা করে ভূ-বিজ্ঞানীরা আরও অনুমান করেন যে, নিম্ন ভূ-ত্বক "জেনোলিথ" (Xenoliths) গঠিত এবং গ্র্যানুলাইট ত্বক আম্লিক (Acidic) চরিত্রের। আইসোটোপ পরীক্ষার মাধ্যমে আরও জানা যায় যে, নিম্ন ভূ-ত্বকের গড় গঠন অসমসত্ত্ব প্রকৃতির (Heterogenous)।

5.2.3 মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক (Oceanic Crust)

এটি স্তরায়িত গঠনের ভূ-ত্বক। উচ্চ মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক মূলত সামুদ্রিক অবক্ষেপ গঠিত। মধ্য মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামুদ্রিক অবক্ষেপ এবং ব্যাসল্ট শিলায় তৈরি। তবে নিম্ন মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক সমগভীরতা সম্পন্ন ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত (Ocean floor basalt)। মধ্যসাগরীয় শিরা (Mid Oceanic Ridge)-র ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের সাথে মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের নিবিড় সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তবে "গায়েট" (Guyots) অর্থাৎ সামুদ্রিক পর্বত শীর্ষ (Sea Mounts) এবং সামুদ্রিক দ্বীপগুলি ক্ষারীয় ব্যাসল্ট (Alkali-rich basalt) দিয়ে তৈরী।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের শিলার চরিত্র সমান নয়; যেমন আকৃতি (Morphology), গঠন (Structure) ও ভূ-পদার্থ বা জিও-ফিজিওক্যাল বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ইত্যাদি।

5.3 ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক

মহাদেশ ও মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের গভীরতা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের গভীরতা মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের তুলনায় বেশি। এটা অনেকটা একটা গাছের বৈশিষ্ট্যের মত। যে গাছ যত লম্বা তার শিকড়ও মাটির মধ্যে তত গভীর। একটা বিশাল বটগাছ তার শিকড়কে মাটির যত গভীরে পৌঁছে দেয়, ধান বা ঘাসের মত উদ্ভিদ কখনই তত নীচে তার শিকড়কে চালনা করে না। এর কারণ হল শিকড়ের গভীরতা সর্বদা সেই গাছের উচ্চতার সাথে আনুপাতিক।

ভূ-ত্বকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যেখানে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি-র মত ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু অংশগুলি অবস্থিত, ঠিক তার নীচে ভূ-ত্বকের গভীরতা তত বেশি। অর্থাৎ গুরুমণ্ডলের মধ্যে ভূ-ত্বকের এই অংশগুলি (পাহাড় এবং মালভূমি) তার শিকড়কে (Root) প্রোথিত করেছে। এ থেকে বলা যায় যে, গুরুমণ্ডলের উপরে ভূ-ত্বক ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। ভূবিজ্ঞানী এরি (G.B. Airy) 'র মতবাদ এই ধারণাকে সমর্থন করে। তবে ভূ-বিজ্ঞানী প্র্যাট (J.H. Prat)-এর ধারণা এরি-র ধারণার থেকে আলাদা। নীচে এরি ও প্র্যাটের ধারণাগুলি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

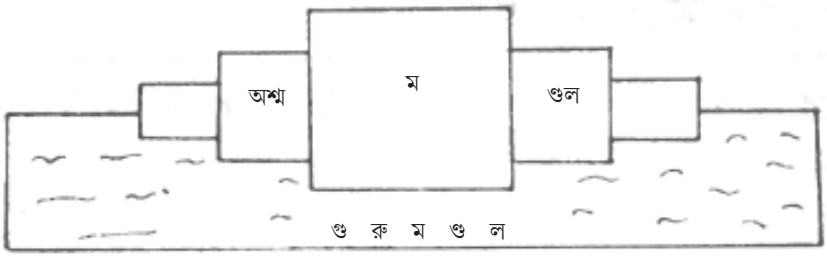

চিত্র 5.3 : *ভূ-ত্বকের উচ্চতা অনুযায়ী এরির ধারণা।*

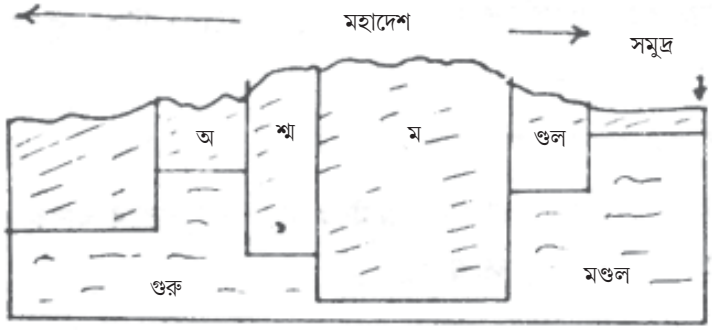

চিত্র 5.4 : *ভূমিরূপ ও ভূ-ভাগের ঘনত্ব অনুযায়ী এরির ধারণা।*

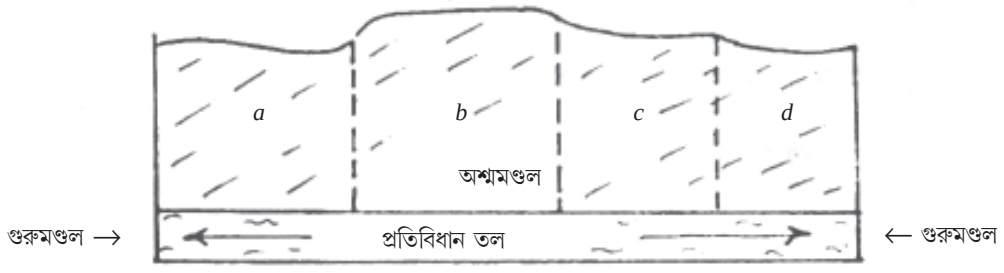

চিত্র 5.5 : *প্র্যাটের ধারণা অনুযায়ী গুরুমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের সম্পর্ক।*

(a : অন্তর্দেশীয় সমভূমি, b : মালভূমি, c : উপকূলীয় সমভূমি, d : উপকূল সন্নিহিত সমুদ্র)

গুরুমণ্ডল ও ভূ-ত্বকের মধ্যে এই সম্পর্ককে সমস্থিতিবাদ (Isostasy)-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে ভূ-ত্বকের ভৌত-রাসায়নিক ও ভৌত-পদার্থ বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই সম্পর্কে সর্বদা গতিশীল (dynamic) বা পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে। যেমন, হিমালয়ের উচ্চতা ক্রমাগত বেড়ে চলার কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, হিমালয়ের শিলাগঠিত শিকড় (Roots) গুরুমণ্ডলের মধ্যে অত্যাধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে ক্রমশ গলে যাচ্ছে। যার ফলে গুরুমণ্ডলের উপরে হিমালয়ের নিম্নচাপ হ্রাস পাচ্ছে এবং তার ফলে হিমালয়ের উচ্চতা প্রতিবিধান তলের সাপেক্ষে বেড়ে চলেছে। যেমন, একটি জলপূর্ণ পাত্রে একটি কাঠের ব্লক বা ঘনককে চেপে ধরলে তা জলের মধ্যে ঢুকে থাকবে, কিন্তু ঐ ঘনকটির উপর চাপ কমালেই তা সাথে সাথে জলের উপরে ভেসে উঠবে।

5.4 ভূ-ত্বকের গুরুত্ব—জীবজগতে ভূ-ত্বকের ভূমিকা তথা মানুষ ও ভূ-ত্বকের মধ্যে সম্পর্ক

ভূ-ত্বকের উপরে একদিকে রয়েছে নদী-নালা-জলাভূমি-মহাসাগরের সমষ্টি। অর্থাৎ জলমণ্ডল বা বারিমণ্ডল (Hydrosphere)। অন্যদিকে পাহাড়-মরু-সমভূমি, অর্থাৎ স্থলভাগ। আর ভূ-ত্বকের এই স্থল ও জলভাগকে বাইরে থেকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল।

আসলে ভূ-ত্বকের উপরে জল-মাটি-বায়ুর নিবিড় রাসায়নিক সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে এমন এক সুষম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ সবাই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। জীবনের লক্ষণ যুক্ত এই মণ্ডলটিকে জীবমণ্ডল (Biosphere) বলে। ভূ-ত্বক না থাকলে জীবমণ্ডল গড়ে উঠতে পারতো না।

আবার ভূ-ত্বক বা ভূ-পৃষ্ঠ হল মানুষের সংসার বা লীলাভূমি। কারণ ঃ

(1) মানুষ জমিকে নিজের কাজে লাগিয়ে, জমিকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে, নানাভাবে তার সমাজ ও অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছে।

(2) মানুষ জমিকে ব্যবহার করে কৃষিকাজ করে।

(3) মানুষ জমিকে ব্যবহার করে পশুপালন করে।

(4) মানুষ ভূ-ত্বকের গভীর এলাকা থেকে নিজ সম্পদ আহরণ করে।

(5) মানুষ বনভূমি থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে।

(6) মানুষ নদী, হ্রদ, পুকুর, জলাশয়, সমুদ্র থেকে মাছ শিকার করে।

(7) মানুষ সমুদ্রের তলদেশ থেকে খনিজ সম্পদ আহরণের চেষ্টা করে।

(8) মানুষ উপযুক্ত পরিবেশে নিজের পছন্দ অনুযায়ী জায়গা বেছে নিয়ে জনবসতি গঠন করে, ইত্যাদি।

5.5 সারাংশ

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সমকেন্দ্রিক বৃক্কের মত। ভূগোলকে সবার উপরে রয়েছে ভূ-ত্বক। তার নীচে গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রমণ্ডল। ভূ-ত্বকের দুটি অংশ। একটি হল মহাদেশ গঠনকারী মহাদেশীয় ত্বক এবং অন্যটি মহাসাগরের তলদেশ গঠনকারী মহাসাগরীয় ত্বক। গ্রানাইট, গ্র্যানোডায়োরাইট জাতীয় হালকা আগ্নেয় শিলা মহাদেশীয় ত্বক তৈরি করেছে। অন্যদিকে ব্যাসল্ট, গ্যাব্রো, পেরিডোটাইট-এর মত ভারি আগ্নেয় শিলা মহাসাগরীয় ত্বক গঠন করেছে। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে মহাদেশীয় ত্বক রয়েছে "সিয়াল" বা "সায়াল" (Sial)-এর উপরে। আর মহাসাগরীয় ত্বক "সায়মা" বা সিমা (Sima)-র উপরে। সিয়াল ও সিমার মধ্যে আছে কনরাড বিযুক্তি, ভূ-ত্বক ও গুরুমণ্ডলের সংযোগস্থলে মোহো বিযুক্তি এবং গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে গুটেনবার্গ বিযুক্তি। ভূ-কম্পীয় তরঙ্গের বিচার বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ভূ-ত্বক এই পৃথিবীর পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। ভূ-ত্বকের উপরে যে গাছপালার আবরণ আছে, মাটির আবরণ আছে, বা বিরাট জলরাশি আছে, তা জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং সম্পদ আহরণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

5.6 প্রশ্নাবলী

(1) ভূ-ত্বকের গুরুত্ব কী?

(2) ভূ-ত্বকের অনুসন্ধান কেন প্রয়োজন? এই অনুসন্ধান কিভাবে করা যায়?

(3) ভূ-ত্বকের গঠনটি কেমন?

(4) ভূ-ত্বক ও ভূমিরূপের মধ্যে সম্পর্ক কী?

(5) সমস্থিতিবাদ কী?

(6) সমস্থিতিবাদের আলোকে ভূ-ত্বকের বৈশিষ্ট্য কেমন?

5.7 উত্তর সংকেত

(1) উত্তরের জন্য 5.4 অংশ দেখুন।

(2) উত্তরের জন্য 5.1 অংশ দেখুন।

(3) উত্তরের জন্য 5.2 অংশ দেখুন।

(4) উত্তরের জন্য 5.3 অংশ দেখুন।

(5) উত্তরের জন্য 5.3 অংশ দেখুন।

(6) উত্তরের জন্য 5.3 অংশ দেখুন।

একক 6 □ শিলা ঃ উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.2 শিলার উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ

6.3 আগ্নেয় শিলা

6.3.1 আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ ও বিবরণ

6.3.2 আগ্নেয় শিলার বণ্টন

6.4 পাললিক শিলা

6.4.1 পলির উৎস

6.4.2 পলি শিলীভবন প্রক্রিয়া

6.4.3 পাললিক শিলার গ্রথন, গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

6.5 পাললিক শিলার শ্রেণীবিভাগ

6.5.1 সংঘাত পাললিক শিলা

6.5.2 অ-সংঘাত পাললিক শিলা

6.6 রূপান্তরিত শিলা

6.6.1 রূপান্তর প্রক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

6.6.2 রূপান্তরিত শিলার রূপভেদ

6.6.3 রূপান্তরিত শিলার শ্রেণীবিভাগ

6.7 ভূমিরূপে গঠনে শিলার প্রভাব

6.7.1 গঠনের প্রভাব

6.7.2 শিলাগুণের প্রভাব

6.7.3 নতির প্রভাব

6.8 সারাংশ

6.9 প্রশ্নাবলী

6.10 উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা

আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, ভূত্বকের সম্পূর্ণাংশ ও গুরুমণ্ডলের বাইরের অংশ যে প্রধান উপাদান দিয়ে গঠিত তা হল শিলা বা পাথর। পৃথিবীর গঠনকারী অঙ্গ ও অনুষঙ্গাগুলির প্রসঙ্গে একে অশ্মমণ্ডল বলে। এখানে হাল্কা সিলিকা, অ্যালুমিনিয়ম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদিতে সায়াল বা সিয়াল (Sial) অর্থাৎ সিলিকেট স্তর গঠিত হয়েছে। আগেই পৃথিবীর রাসায়নিক গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এক ধরনের উল্কা যেমন 'কার্বনেসিয়াস কন্‌ড্রাইট' এর সঙ্গে যার বহুলাংশেই মিল আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নানান ভূ-আন্দোলন ইত্যাদির ফলে পৃথিবীর শৈশবকালের অত্যধিক নরম বা কাঁচা ও পাতলা ভূত্বক ফেটে পাথর বেরিয়ে এসেছিল। ভেতর থেকে গলিত পাথর, বিশেষ করে কালো-ব্যাসল্ট প্রভৃতি, প্রবল বেগে উপরে উঠে এসেছিল। সেই সঙ্গে বেরিয়েছিল প্রচুর পরিমাণে বাষ্প বা জল-সহ গ্যাস-কার্বন ডাইঅক্সাইড, গলন্ত পাথর বা লাভা ইত্যাদি উদগীর্ণ হয়ে ভূপৃষ্ঠে জমা হয়েছিল। এ সবের মধ্যে হাইড্রোক্সিলবাহী মণিক যেমন অভ্র, সার্পেন্টিন, অ্যাম্ফিবোল প্রভৃতি দেখা যায়।

শিলা বা পাথর হল কঠিন জৈব (organic) বা অজৈব (inorganic) পদার্থে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুপিন্ড বিশেষ। সাধারণভাবে শিলা বা পাথর বলতে শক্ত শিলা বা পাথরকেই বোঝায়। তবে শক্ত-গ্রানাইট শিলা বা পাথর থেকে আরম্ভ করে নদ-নদীর নরম পলি সবই এই শিলার অন্তর্ভুক্ত। ভূ-ত্বকের বা পৃথিবীর ভিতরের সব শিলাই গঠিত হয়েছে এক বা একাধিক খনিজ মিলিয়ে। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন সব রাসায়নিক যৌগকে খনিজ বলে। যেমন, লবণ (শিলায়)-এ একটি মাত্র খনিজ বিদ্যমান। অন্য উদাহরণ হিসেবে গ্রানাইট পাথরে কয়েকটি খনিজ অর্থাৎ কোয়ার্টজ, ফেলস্পার, অভ্র, টুরমেলিন ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখতে হবে, গ্রানাইট শিলায় তার খনিজের মিশ্রণের তারতম্যের জন্য বহুরকম উদাহরণ পাওয়া যায়। এই প্রকার খনিজ মানুষের বহু কাজে প্রয়োজন হয়। আমাদের সভ্যতার অগ্রগতিতে খনিজ সম্পদের অবদান অসামান্য। প্রধানত আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত শিলা—এই তিন প্রকার বা শ্রেণীর শিলার সৃষ্টি হয়ে ভূ-ত্বক গঠিত হয়েছে।

ভূত্বকের মোট গভীরতার বিচারে বেশিরভাগই দখল করেছে আগ্নেয় শিলা। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে উঠে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা ক্রমশ ঠাণ্ডা আর কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে, এমনকি বর্তমানেও ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা তরল শিলা বা লাভা থেকে এই শিলার উৎপত্তি হয়েছে ও এর সৃষ্টির কাজ চলছে। আবার অশ্মমণ্ডলের উপরের অংশ বিশেষত ভূ-পৃষ্ঠের গঠনে দেখা যায় যে এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই (75 শতাংশ) পাললিক শিলায় সৃষ্টি। এই পাললিক শিলার আস্তরণের নীচেই সাধারণত অন্যান্য শিলা যেমন আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা ভূত্বকের গঠনের উপর নির্ভর করে বিরাজমান। শিলার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্তরীভূত শিলার কথা, যা মুখ্যত পাললিক শিলার অন্তর্গত, বলা দরকার। শিলার এক একটি স্তর যেন ভূত্বকের তথা

পৃথিবীর ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা। আগেই জেনেছি যে, ভূত্বকের অন্যতম প্রধান উপাদানের মধ্যে স্তরীভূত শিলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর প্রধান পরিচয় হল শিলাদেহে স্তরায়নের চিহ্ন। কেননা, স্তরের পর স্তর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত হয়ে এই স্তরীভূত শিলার সৃষ্টি হয়। পাললিক শিলা ছাড়া ব্যাসল্ট লাভা, ভস্মস্তর ইত্যাদি কয়েক প্রকার আগ্নেয় শিলাকেও স্তরীভূত শিলার অন্তর্গত বলে ধরা হয়। এই শিলাস্তর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, বিশেষ করে তাদের গুণাগুণ ও জৈবিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে, ভূত্বক তথা পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তনের গোটা ইতিহাস জানা সম্ভব। কেবলমাত্র শিলা থেকে খনিজ সম্পদ, জল, মাটি ইত্যাদি সম্পদ সংস্থানের জন্যই নয়—এর বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধান করলে ভূত্বকের ও সেইসঙ্গে ভূমিরূপ, স্তর ইত্যাদির উদ্ভব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করা সম্ভব। এই সকল কারণেই আমাদের কাছে শিলার গঠন, উৎপত্তি এবং শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অধ্যয়ন বিশেষ জরুরী ব্যাপার।

অতএব শিলা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি অবশ্যই মনে রাখবেন : (1) শিলা বলতে জৈব এবং অজৈব পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট কঠিন প্রাকৃতিক বস্তুপিন্ডকে বোঝায়। (2) শিলা হল বিভিন্ন খনিজের সমষ্টি। আর খনিজ বা মণিক (mineral) হল প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন সব রাসায়নিক পদার্থের যৌগ। (3) শিলা ভূগঠন তৈরি করে। (4) ভূ-গঠন ভূমিরূপকে প্রভাবিত করে। (5) ভূমিরূপ পরিবেশ ও মানুষের নানা কাজকে প্রভাবিত করে। (6) শিলা সম্পর্কে ভালভাবে জানা না থাকলে একদিকে যেমন পরিবেশকে জানা যায় না, তেমনি অন্যদিকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেখানে জমি বা ভূমিকেন্দ্রিক, সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা করা যায় না।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

শিলা ও খনিজ বা মণিকের (mineral) সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।

শিলার উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

শিলার শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

আগ্নেয় শিলাকে কিভাবে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তা দেখাতে পারবেন।

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।

পাললিক শিলার শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

রূপান্তরিত শিলা কিভাবে গড়ে ওঠে তার ধারণা দিতে পারবেন।

ভূমিরূপ গঠনে শিলার প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

6.2 শিলার উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ

আপনারা জেনেছেন যে, ভূত্বকের গঠনে ও বিন্যাসে প্রধান উপাদান হল শিলা বা পাথর। আবার ভূত্বক তৈরি হয়েছে যে শিলা বা পাথরে, তার ভিত্তি অর্থাৎ বনিয়াদ হল খনিজ পদার্থ। ভূত্বকের উদ্ভব ও ভূমিরূপ বিদ্যায় শিলা এক জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জানি, ভূ-পৃষ্ঠে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে শিলা ভূমিরূপ গঠনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিলার বিভিন্ন গুণাবলী, যেমন—যান্ত্রিক কাঠিন্য, আবহিকবিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা, প্রবেশ্যতার মাত্রা, শিলার গ্রথন, দারণ এবং ফাটলের মাত্রা প্রভৃতি ক্ষয়কার্যের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং শিলার উপর বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের ফলেই বিভিন্ন রকম ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, পাললিক শিলায় রক্ষিত জীবাশ্ম পৃথিবীর ভূ-তত্ত্বীয় ইতিহাস উদঘাটনে সাহায্য করে।

শিলা ও খনিজ : শিলা খনিজের সমষ্টি বিশেষ এবং খনিজ (বা মণিক) হল প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন সব রাসায়নিক যৌগ। কাজেই শিলা সম্পর্কে পর্যালোচনার আগেই খনিজ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের ভূ-ত্বকে প্রাপ্ত খনিজগুলোর 99% ই দশটি প্রধান মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে প্রাপ্ত শিলা গঠনকারী প্রধান খনিজের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এটি অনুধাবন করা যায় যে, দুটো মৌল উপাদান অক্সিজেন এবং সিলিকনই ভূ-ত্বকের ওজনের শতকরা প্রায় 75% অধিকার করে রয়েছে। এই জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ সিলিকন এবং অক্সিজেনের যৌগ অর্থাৎ সিলিকেট খনিজ (বা মণিক)।

সিলিকন খনিজের কেলাস কাঠামোতে (Crystal Structure) একটা সাধারণ নিয়ম রয়েছে যে, একটা সিলিকন পরমাণুর চারপাশে চারটে অক্সিজেন পরমাণু এমনভাবে ঘিরে থাকে যে, ঐ অক্সিজেন অণুর অবস্থান একটা চতুস্তলকের শীর্ষবিন্দু নির্দেশ করে, আর ঐ চতুস্তলকের কেন্দ্রে থাকে একটা সিলিকন পরমাণু (চিত্র 6.1)। সুস্থিত যৌগে এরকম সিলিকন-অক্সিজেন একক মাত্র কয়েক প্রকারে পরস্পর সংযুক্ত থাকতে পারে। সেজন্য শিলা গঠনকারী খনিজের সংখ্যা সীমিত হয়েছে। সিলিকন খনিজের এককগুলোর পরস্পর সংযোগের পর এদের মধ্যে যে ফাঁক থাকে সেখানে অন্যান্য মৌলের অন্তর্ভুক্তি হতে পারে। এই মৌলের সংখ্যা এমনভাবে নিরূপিত হয় যে সংযোজনের পর কেলাস কাঠামো তড়িৎ নিরপেক্ষ হয়। যেমন SiO_4^{-4} চতুস্তলক এককে দুটো Mg^{2+} যুক্ত হলে কেলাস কাঠামো তড়িৎ নিরপেক্ষ হয়। অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি মৌল সিলিকন-অক্সিজেন কেলাস কাঠামোয় সংযুক্ত হলে এই সমস্ত ধাতু-গঠিত সিলিকেট খনিজের সৃষ্টি হয়।

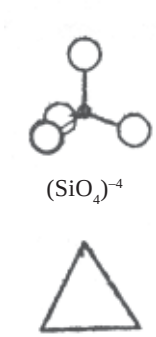

চিত্র 6.1 : *SiO_4 চতুস্তলক।*

SiO_4^{-4} চতুস্তলক এককের পরস্পর সংযোজন এবং এর উপর নির্ভরশীল কেলাস কাঠামোর বিভিন্নতা অনুযায়ী সিলিকেট খনিজকে আমরা প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :

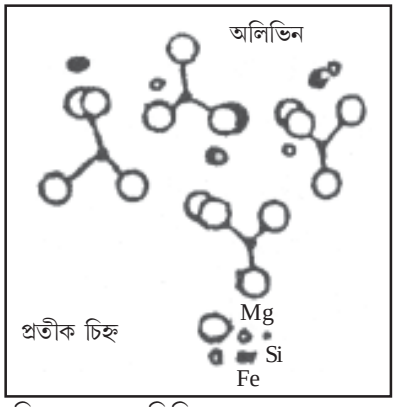

চিত্র 6.2 : *অলিভিনে SiO_4 চতুস্তলকে বিন্যাস।*

(1) নেসোসিলিকেট বা অর্থোসিলিকেট (Nesosilicate or Orthosilicate) : এখানে SIO_4^{-4} চতুস্তলক একটি স্বাধীন একক তৈরি করে। যেমন অলিভিনের $\{(Mg, Fe)SiO_4\}$ ক্ষেত্রে দেখা যায়। এক্ষেত্রে চতুস্তলক এককে দুটো Mg বা দুটো Fe বা একটা Mg ও একটা Fe স্থান করে নেয়। এতে ঐ চতুস্তলক এককে তড়িৎ নিরপেক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফায়েলাইট (Fe_2SiO_4) এবং ফোরস্টেরাইট (Mg_2SiO_4) অনুরূপ কারণে নেসোসিলিকেট বিশেষ। এই কেলাস কাঠামোতে Fe ও Mg সমভাবে বণ্টিত থাকে এবং দুর্বল বন্ধনযুক্ত বিশেষ কোন তল দেখা যায়না। এজন্য এই ধরণের খনিজের কোন সুগঠিত সম্ভেদ নেই।

(2) আইনোসিলিকেট বা মেটাসিলিকেট (Inosilicate) : জার্মান ভাষায় Inos-এর অর্থ হল সুতো বা তন্তু। এরকম ক্ষেত্রে SiO_4 চতুস্তলক পরস্পর যুক্ত হয়ে $(SiO_3)^{2-}$-এর শৃঙ্খল তৈরি হয়। চারটি অক্সিজেনের আটটি বন্ডের চারটি সিলিকন বন্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে, দুটি বন্ড পাশের চতুস্তলক এককের

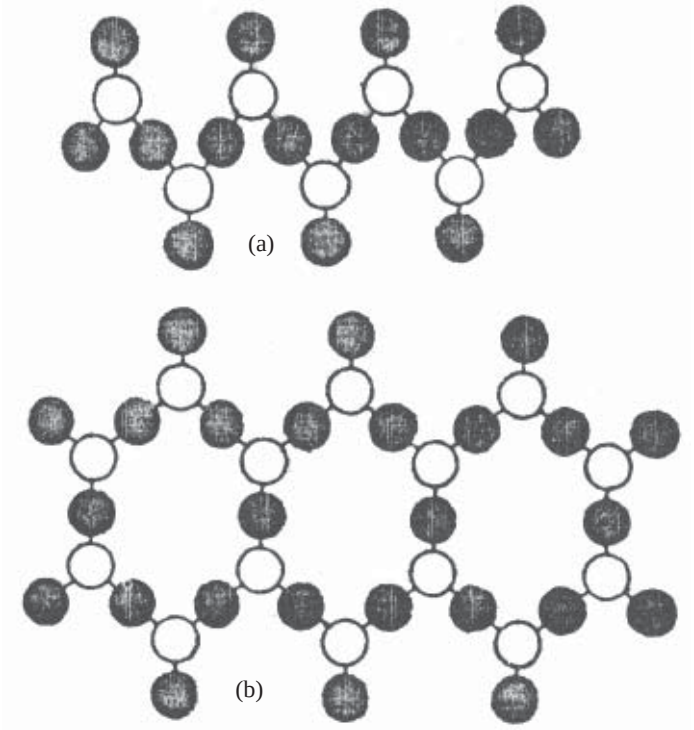

চিত্র 6.3 : *(a) পাইরক্সিন, (b) অ্যাম্ফিবোলে SiO_4 শৃঙ্খলের গঠন। কেবলমাত্র অক্সিজেন পরমাণু দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ফাঁকাবৃত্ত চিহ্নিত পরমাণুর সন্নিহিত তিনটি পরমাণু (কালো বৃত্ত চিহ্নিত) নিয়ে চতুস্তলক গড়ে তুলেছে। ফাঁকা বৃত্ত চিহ্নিত পরমাণুটি অন্য পরমাণুগুলো থেকে একটু ওপরে রয়েছে ধরে নিতে হবে এবং সিলিকন পরমাণুকে আড়াল করে রেখেছে। হ্রস্ব রেখাগুলো বন্ড নির্দেশ করছে।*

সঙ্গে যুক্ত থাকে ও দুটো বন্ড মুক্ত থাকে। এই যুক্ত বন্ডের সঙ্গে প্রধানতঃ Fe, Mg, Ca দুটো বন্ড যুক্ত হয়, যেমন $MgSiO_3$। আইনোসিলিকেটকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(i) **পাইরক্সিন** (Pyroxene) : যদি উন্মুক্ত প্রান্তবিশিষ্ট চতুস্তলকের দীর্ঘশৃঙ্খল সৃষ্টি হয় তাহলে সূচের আকৃতিবিশিষ্ট খনিজের সৃষ্টি হয়। এরকম খনিজকে পাইরক্সিন বলে (চিত্র : 6.3a)। $MgSiO_3$ (এন্‌স্টেটাইট Enstatite) এক ধরনের পাইরক্সিন। অন্যান্য পাইরক্সিন শৃঙ্খলের বিভিন্ন চতুস্তলকে এককে Mg ছাড়াও অন্যান্য ধাতব মৌল বন্ড তৈরি করতে পারে। যেমন অগাইট {Augite–$Ca(Mg, Fe)(SiO_3)_2$}, ডাইঅপ্‌সাইড (Diopside–$MgCa(SiO_3)_2$}, হাইপারস্থিন {Hypersthene–$(MgFe)SiO_3$}। এখানে $Ca(Mg, Fe)(SiO_3)_2$ বলতে বোঝায় যে, দুটো শৃঙ্খলিত SiO^{-2} এককের অক্সিজেনের দুটো মুক্ত বন্ড Ca-এর সাথে ও অন্য এককের অক্সিজেনের দুটো মুক্ত বন্ড Mg বা Fe'র সাথে যুক্ত রয়েছে।

যেহেতু চতুস্তলক সম্বন্ধীয় বন্ড অন্যান্য বন্ডের তুলনায় শক্তিশালী সেইজন্য পাইরক্সিনে চতুস্তলক শৃঙ্খলের সমান্তরাল প্রায় পরস্পর লম্ব দু-প্রস্ত সম্ভেদ তলের সৃষ্টি হয়।

(ii) অ্যাম্ফিবোল *(Amphibole)* ***:*** এরকম ক্ষেত্রে চতুস্তলক একক গঠিত দুটো সমান্তরাল শৃঙ্খলের পরস্পর যোগসাধন ঘটে (চিত্র : 6.3b)। সংযুক্ত শৃঙ্খলের এক একটি একক $(SiO_{11})6^-$ দিয়ে গঠিত হয় ও অক্সিজেনের মোট ছবি মুক্ত বন্ড থাকে। এই মুক্ত বন্ড Ca, Mg, Fe, Na, Al আয়ন দিয়ে যুক্ত থাকে। যেমন হর্নব্লেন্ডে দুটি $(Si_4O_{11})^{6-}$ এককে মোট বারোটি মুক্ত বন্ড থাকে। দুটি Ca ও পাঁচটি Mg অথবা Fe-এর মোট চৌদ্দটি বন্ডের বারোটি বন্ড দুটি $(Si_4O_{11})^{6-}$-এর বারোটি মুক্ত বন্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। অতিরিক্ত দুটি ধাতব বন্ড দুটি $(OH)^-$ মূলকের দুটি বন্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তড়িৎ নিরপেক্ষতার সৃষ্টি করে। এইভাবে হর্নব্লেন্ডের রাসায়নিক ফর্মূলা দাঁড়ায় $Ca_2(Mg, Fe)_5(OH)_2(Si_4O_{11})_2$।

যেহেতু চতুস্তলক সম্বন্ধীয় বন্ড শক্তিশালী থাকে, সেইজন্য পাইরক্সিনের মত অ্যাম্ফিবোলের কেলাসে দ্বিশৃঙ্খল বিন্যাসের সমান্তরাল 60° কোণ করে পরস্পরছেদী দু-প্রস্থ সম্ভোদতলের সৃষ্টি হয়।

(iii) ফাইলোসিলিকেট *(Phyllosilicate)* ***:*** ফাইলোসিলিকেটের ক্ষেত্রে (SiO_4) শৃঙ্খলের আড়াআড়ি যোগসাধন পাশের দিকে আরও প্রসারিত হতে পারে (চিত্র : 6.4) ও বায়োটাইট, মাসকোভাইট, ক্লোরাইট, কেওলিনাইট, ট্যাল্কের মত পাতজাতীয় খনিজ সৃষ্টি হয়। এরূপ পাতজাতীয় গঠনের রাসায়নিক সংযুতিতে একতলীয় বিভিন্ন দিকে $(Si_2O_5)^{-2}$ এর দুটি এককে অক্সিজেনের যে চারটি মুক্ত বন্ড থাকে তার দুটি ম্যাগনেসিয়াম আয়নের দুটি বন্ডের সঙ্গে ও বাকি দুটি বন্ড দুই ম্যাগনেসিয়াম বন্ডের প্রত্যেকের একটি বন্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। শেষের দুটি ম্যাগনেসিয়াম আয়নের দুটি মুক্ত বন্ড দুটি $(OH)^-$ মূলকের দুটি বন্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে ট্যাল্কের রাসায়নিক ফর্মূলা দাঁড়ায় $Mg_3(OH)_2(Si_2O_5)_2$।

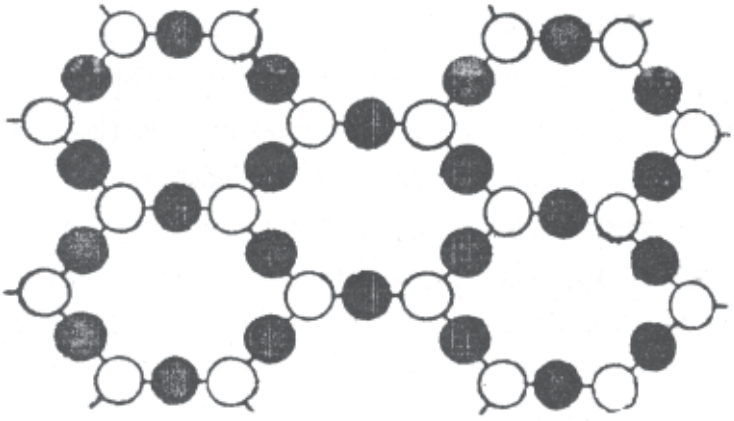

চিত্র 6.4 : *পাত গঠনযুক্ত খনিজে* SiO_4*-এর বিন্যাস। প্রতীক চিহ্নের নির্দেশনা আগের চিত্রের মত।*

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, A1 এর আয়ন ব্যাসার্ধ ও Si-এর আয়ন ব্যাসার্ধের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। সেইজন্য বড় ধরনের পাত-খনিজে কিছু কিছু সিলিকন (Si) অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের বন্ডের সংখ্যা হল 3, তাই তড়িৎ নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য অক্সিজেন ও অন্যান্য ধাতব আয়নগুলোর প্রয়োজনীয় সংখ্যার অল্প পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

যেহেতু কেলাস কাঠামোতে চতুস্তলকীয় তল অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত থাকে, সেইজন্য ফাইলোসিলিকেট, বিশেষ করে মাইকা বা অভ্রে সুগঠিত এক প্রস্থ সমান্তরাল সম্ভেদের সৃষ্টি হয়।

(iv) টেকটোসিলিকেট *(Tectosilicate) :* ফেলস্পার হল এইরকম একপ্রকার খনিজ যা ভূ-ত্বকে সবচেয়ে সুলভ। টেকটোসিলিকেট হল K, Na, Ca এর অ্যালুমিনোসিলিকেট। ফেলস্পার খনিজে (SiO_4) চতুস্তলক একক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন দিকেই পরস্পর যুক্ত হয়ে ত্রিমাত্রিক কাঠামোর (Three dimensional frame work) সৃষ্টি করে। ফেলস্পারের একটি সাধারণ ধর্ম হল Si-এর চারপাশে অক্সিজেন দিয়ে যে চতুস্তলক তৈরি হয় তার কিছু সংখ্যক চতুস্তলকে Si-এর বদলে A1 প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু A1-এর আয়নিক আধান +3, যেখানে Si-এর আয়নিক আধান +4। প্রথমে ধরে নেওয়া যাক যে, কেলাস কাঠামোয় সমস্ত চতুস্তলকই Si-কে ঘিরে রয়েছে এবং এ কাঠামো তড়িৎ নিরপেক্ষ। এখন যদি কিছু সংখ্যক Si-কে A1 দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যায় তাহলে কেলাস কাঠামোর তড়িৎ নিরপেক্ষতায় বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু কেলাস কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে যদি Na, K, Ca-এর ধনাত্মক আয়ন প্রয়োজন অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে ঐ কেলাস কাঠামোকে আবার তড়িৎ নিরপেক্ষ করা সম্ভব। ফেলস্পারে এরকম Na, Ca, K আয়নের চারপাশে সিলিকা বা অ্যালুমিনা চতুস্তলক ভর্তি হয়ে থাকে। Na এবং Ca-এর আয়ন ব্যাসার্ধ বা আয়তন প্রায় সমান। তাই একের বদলে অন্যটি সহজেই প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এইভাবে প্লাজিওক্লেজ নামে এক ধরনের ফেলস্পারের সৃষ্টি হয় এবং এদের ফর্মূলা $NaAlSiO_3O_8$ থেকে $CaAl_3Si_2O_8$ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নানারকম হতে পারে। $NaAlSi_3O_8$-কে অ্যাল্‌বাট আর $CaAl_2Si_2O_8$-কে অ্যানর্‌থাইট বলে। কিন্তু প্লাজিওক্লেজ ফেলস্পারে অ্যাল্‌বাইট এবং

অ্যানর্থাইট বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত থাকতে পারে। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, প্লাজিওক্লেজের রাসায়নিক ফর্মুলায় সব সময়ই অক্সিজেন অণুর সংখ্যা 8 এবং অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকনের সম্মিলিত অণুর সংখ্যা 4। কোনও কেলাস কাঠামোতে এরকম বিভিন্ন রাসায়নিক সংযুতি দেখা গেলে তাকে কঠিন দ্রবণ (Solid Solution) বলে। অলিভিন কেলাস কাঠামোতেও এরকম কঠিন দ্রবণ দেখা যায়।

পটাশ ফেলস্পার বা অর্থোক্লেজ ফেলস্পারের ($KAlSi_3O_8$) কেলাস কাঠামো প্লাজিওক্লেজ ফেলস্পারের অনুরূপ হয়। কিন্তু পটাশিয়াম আয়ন সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম আয়নের থেকে 1/3 অংশ বড় হয়। কাজেই একই কেলাস কাঠামোতে পটাশিয়াম Na এবং Ca-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে জায়গা করে নিতে পারে না এবং পটাশ ফেলস্পার স্বতন্ত্র কেলাস কাঠামো তৈরি করে। অবশ্য পাতলা লাভা খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হলে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ফেলস্পার মিশ্রিত থাকতে পারে, কারণ এদের পৃথকীভবনের মত যথেষ্ট সময় থাকে না। কিন্তু লাভা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলে পটাশ ফেলস্পার পৃথক কেলাসের সৃষ্টি করে। এইজন্য গ্রানাইট শিলায় অনেক সময় প্লাজিওক্লেজ আর গোলাপী অর্থোক্লেজ ফেলস্পার খুব সহজেই চেনা যায়।

যেহেতু ফেলস্পারের কেলাস কাঠামোতে দৃঢ় চতুস্তলকীয় বন্ড ত্রিমাত্রায় বিস্তৃত, সেইজন্য ফেলস্পার বেশ সংসক্ত (choesive) হয় এবং সহজে ফাটে না। কিন্তু কতকগুলো তল বরাবর বন্ড-ঘনত্ব (bond density) অর্থাৎ প্রতি একক ক্ষেত্রে বন্ড অতিক্রম করার সংখ্যা নিম্নতম থাকে। সেইজন্য ঐ তল বরাবর ফেলস্পারের ভেঙে যাবার প্রবণতা থাকে ও কাঠামোয় সম্ভেদের সৃষ্টি হয়।

কোয়ার্টাজ (SiO_2) আর একটা সুপরিচিত খনিজ। এই ক্ষেত্রে চতুস্তলকগুলি ত্রিমাত্রিক দিকে বিস্তৃত থাকে এবং প্রত্যেক অক্সিজেনের অণু পাশাপাশি দুই চতুস্তলকের অংশীদার হয়। অতএব প্রত্যেক সিলিকন অণুর জন্য দুটি অক্সিজেন অণু থাকে। অন্য কোন মৌলের আয়ন ছাড়াই এরা তড়িৎ নিরপেক্ষ থাকছে। কারণ সিলিকন অণুর আয়নিক আধান +4 ও দুটি অক্সিজেন অণুর মোট আয়নিক আধানও –4 থাকে।

অন্যান্য সিলিকেট খনিজ : চতুস্তলক সমষ্টি, তাদের একক বা দ্বি-শৃঙ্খল, পাত, ত্রিমাত্রিক কাঠামোর খনিজগুলোই শিলা উৎপাদনকারী খনিজের সিংহভাগ অধিকার করে আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য ধরনের সিলিকেট খনিজ গঠন হতে পারে না। যেমন আংটির মত বিন্যস্ত চতুস্তলকগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে সুন্দর বেরিলের (Beryl) সৃষ্টি করে।

ভূ-ত্বকে সিলিকেট খনিজগুলোই শিলার অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে। এই মধ্যে প্লাজিওক্লেজ, অর্থোক্লেজ, কোয়ার্টজ, পাইরক্সিন, অ্যাম্ফিবোল, মাইকা, কর্দম ও অলিভিনের অবদান হল 91.4%। অবশিষ্ট 8.4%-এর অধিকাংশ অ-সিলিকেট খনিজ। কর্দম ছাড়া বাকি সিলিকেট খনিজগুলো আগ্নেয় শিলায় পাওয়া যায়।

অন্যান্য খনিজ : সিলিকেট ছাড়াও হ্যালাইড, অক্সাইড, কার্বনেট, সালফেট, ফসফেট জাতীয় খনিজও অল্প পরিমাণে ভূ-ত্বকে পাওয়া যায়। নীচের সারণীতে বিভিন্ন খনিজের তালিকা রাসায়নিক সংযুক্তি-সহ প্রকাশ করা হল। এখানে বলা দরকার যে, বিভিন্ন খনিজের বিশেষ করে সিলিকেট খনিজের রাসায়নিক সংযুতি সরল করে প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রেণীর নাম	মূলক	উদাহরণ ও রাসায়নিক সংযুক্তি
নেসোসিলিকেট	$SiO4^{4-}$	অলিভিন $\{Mg, Fe)_2SiO_4\}$
(Nesosilicate)		গার্নেট $\{Ca, Mg, Fe), (Al, Fe) (SiO_4)_3\}$
		জার্কন $\{ZrSiO_4\}$
আইনোসিলিকেট		হাইপারস্থিন $\{(Mg, Fe) SiO_3\}$
(Inosilicate)		ডাই-অক্সাইড $\{Ca(Mg, Fe) (SiO_3)_2\}$
a. পাইরক্সিন—	SiO_3^{2-}	অগাইট $\{Ca (Mg, Fe, Al) (Al, Si)_2O_4\}$
প্রসারিত একক শৃঙ্খল		
b. অ্যাম্ফিবোল—	$Si_4O_{11}^{4-}$	হর্নব্লেন্ড $\{Ca_2 (Mg, Fe)_5(OH)_2$
প্রসারিত যুগ্ম শৃঙ্খল		$(Si_4O_{11})_2\}$—সরলীকৃত
ফাইলোসিলিকেট		ট্যাল্ক $\{Mg_3 (OH)_2 (Si_2O_5)_2\}$
(Phyllosilicate)		সার্পেন্টাইন $\{Mg_3(OH)_4Si_2O_5\}$
ষড়ভুজাকৃতি জালকের	$Si_2O_3^{-2}$	কর্দম খনিজ $\{Al_2(OH)_4Si_2O_5\}$
সমতলীয় বিস্তার	$AlSi_3O_{10}$	মাসকোভাইট $\{KAl_2(OH)_2Si_3AlO_{10}\}$
টেকটোসিলিকেট	Si_4O_8	কোয়ার্টজ (SiO_2)
(Tectosilicate)		অর্থোক্লেজ $\{K(AlSi_3)O_8\}$
চতুস্তলক কাঠামোর	$AlSi_3O_8$	অ্যালবাইট $\{Na(AlSi_3)O_8\}$
ত্রিমাত্রিক বিস্তার	$Al_2Si_2O_8^{-2}$	অ্যানর্থাইট $\{Ca(Al_2Si_2)O_8\}$
		নেফেলিন $\{Na(AlSi)O_4\}$
হ্যালাইড	Cl^- বা F^-	হ্যালাইট $(NaCl)$
	ইত্যাদি	ফ্লোরাইট (CaF_2)
সালফাইড	S^{2-}	গ্যালেনা (PbS), চ্যালকোপাইরাইট $\{CuFeS_2\}$
		পাইরাইট $\{FeS_2\}$
অক্সাইড	O^{-2}	হেমাটাইট $\{Fe_2O_3\}$
		ম্যাগনেটাইট $\{Fe_3O_4\}$
		ইলমেনাইট $\{FeTiO_3\}$
কার্বনেট	CO_3^{2-}	ক্যালসাইট $\{CaCO_3\}$
		ডলোমাইট $\{CaMg(CO_3)_2\}$
সালফেট	SO_4^{2-}	জিপসাম্ $\{CaSO_4, 2H_2O\}$
		অ্যানহাইড্রাইট $\{CaSO_4\}$
		ব্যারাইট $\{BaSO_4\}$
ফসফেট	$(PO_4)^{3-}$	অ্যাপেটাইট $\{Ca_5(F_2OH)P_3O_{12}\}$

6.3 আগ্নেয় শিলা

গলিত অর্থাৎ তরল বা প্রায় তল অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যে সব শিলা তৈরি হয় তাদের আগ্নেয় শিলা বলে। আমাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে যে, আগ্নেয়গিরি থেকে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা পদার্থ বহির্গত হয় ও এগুলো ঠাণ্ডা হয়ে শিলায় পরিণত হয়। এই অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে এরকম গলিত পদার্থ রয়েছে বা বিশেষ অবস্থার এর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে গলিত তরল পদার্থ থাকে বা সৃষ্টি হয় তাকে ম্যাগমা বলে। ভূ-পৃষ্ঠে নির্গত হলে ম্যাগমার ওপর চাপ কমে যায়। এবং বাষ্প ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ ম্যাগমা থেকে বার হয়ে গিয়ে তরল লাভায় পরিণত হয়। কিন্তু ম্যাগমা অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসৃত হবার আগেই জমে যায়—এরকম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। এ বিষয়ে স্তরীভূত শিলাই নির্ভরযোগ্য সূত্রের সন্ধান দেয়। স্তরীভূত শিলা ভূ-পৃষ্ঠ বা উপকূল অঞ্চলে সৃষ্টি হয়—এদের শনাক্তকরণ ও অ-পাললিক শিলা থেকে পৃথক করা সহজ। অনেক স্থানে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, এমন কিছু শিলা আছে যেগুলি পাললিক শিলাকে কেটে অগ্রসর হয়েছে, বা দু'টি স্তরের মধ্যে অবস্থান করছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, অ-পাললিক শিলার ওপর পাললিক শিলার আবরণ ছিল। যেখানে ঐ অ-পাললিক শিলার সংযোগ হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে, পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে অন্য এক প্রকার শিলার সৃষ্টি করেছে। সংযোগমণ্ডল থেকে যতদূরে যাওয়া যায়, পাললিক শিলার রূপান্তরের মাত্রা তত কমতে থাকে এবং বেশ কিছু দূরে ঐ পাললিক শিলাকে অরূপান্তরিত অবস্থায় দেখা যায়। ওপরের অবস্থা এই সাক্ষ্য বহন করে যে, পাললিক শিলার সৃষ্টির পর ঐ অ-পাললিক শিলা সৃষ্টি হয়েছে? যা পাললিক শিলাকে রূপান্তরিত করেছে। কাজেই ঐ অ-পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা নয়। এটা আগ্নেয় শিলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এছাড়াও খনিজ প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যমূলক গ্রথন প্রভৃতি থেকেও আগ্নেয় শিলাকে শনাক্ত করা যায়। যেমন, পাললিক শিলার মূল খনিজগুলোর দানার মধ্যে ফাঁক থাকে এবং ঐ দানার ফাঁকে ফাঁকে বর্তমান সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ তাদের জুড়ে রাখে। আগ্নেয় শিলার খনিজ কেলাসগুলো গায়ে গায়ে লাগানো থাকে ও একে অপরকে অতিক্রম করে। এদের সংসক্তির (cohesion) জন্য কোন সিমেন্ট জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয় না।

6.3.1 আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ ও বিবরণ

বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি অনুসারে আগ্নেয় শিলাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(a) উৎপত্তিস্থল অনুসারে শ্রেণীবিভাগ ঃ উৎপত্তিস্থল হিসেবে আগ্নেয় শিলাকে প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা উদ্বেধী ও নিঃসারী আগ্নেয় শিলা। যে সমস্ত আগ্নেয় শিলা ভূ-অভ্যন্তরে ম্যাগমার কঠিনীভবনের ফলে সৃষ্ট হয় তাদের উদ্বেধী আগ্নেয় শিলা বলে। উদ্বেধী আগ্নেয় শিলাকে আবার দুই উপবিভাগে ভাগ করা হয়। গভীর ভূ-অভ্যন্তরে যে উদ্বেধী শিলার সৃষ্টি হয় তাকে পাতালিক (Plutonic) আগ্নেয় শিলা এবং যে উদ্বেধী আগ্নেয় শিলার অগভীর ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়, তাকে উপ-পাতালিক (Hypabyssal) আগ্নেয় শিলা বলে। গ্রানাইট, গ্যাব্রো, সায়েনাইট, ডায়োরাইট প্রভৃতি পাতালিক আগ্নেয়

শিলা। রায়োলাইট, ব্যাসল্ট, ট্র্যাকাইট, অ্যান্ডেসাইট নিঃসারী আগ্নেয় শিলা ও পরফিরি উপ-পাতালিক আগ্নেয় শিলার উদাহরণ। সাধারণত পাতালিক শিলার খনিজগুলো বড় (খালি চোখে দেখা যায়) ও নিঃসারী শিলার খনিজ কেলাসগুলো খুবই ছোট (অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেবল দেখা যায়) বা কাচ জাতীয় হয়ে থাকে। উপ-পাতালিক শিলায় ছোট ও বড় দুই রকম খনিজ কেলাস মিশ্রিত থাকে। এতে কিছু পরিমাণ কাচও উপস্থিত থাকতে পারে।

(b) গ্রথন হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ঃ আগ্নেয় শিলায় কেলাসিত দানা ও কাচ যে রকমভাবে সাজান থাকে তার থেকেই এর গ্রথন (texture) উৎপন্ন হয়। গ্রথন সুষ্ঠুভাবে জানতে হলে চারটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। (i) কেলাসের পরিমাণ অর্থাৎ কতটা কেলাস হয়েছে (ii) কেলাস বা দানার মাপ (iii) কেলাসগুলোর আকার এবং (iv) কেলাসগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, বা কেলাস ও কাচ জাতীয় পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক।

একটা শিলায় যদি খালি চোখে বা পকেট লেন্সের সাহায্যে সব কেলাসের দানা দেখা যায়, তাহলে তাকে ফ্যানেরোকৃস্টালাইন বা ফ্যানেরিক গ্রথন বলে। এরকম গ্রথনযুক্ত পাথরকে ফ্যানেরাইট বা হলোকৃস্টালাইন শিলা বলে। অপরপক্ষে কেলাস দানাগুলি যদি খালিচোখে বা পকেট লেন্সের সাহায্যে দেখা না যায়, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, তাহলে ঐ শিলার গ্রথনকে অ্যাফিনিটিক বলা হয়। যদি কোনও শিলায় খনিজ কেলাস অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এই শিলার গ্রথন কাচ জাতীয় হয়। কাচের মধ্যে অণু ও পরমাণু কেলাসের মত একটা নিয়মিত পদ্ধতিতে সাজানো থাকে না। কিন্তু কেলাস গঠনের শক্তিগুলো সক্রিয় থাকে বলে কাচের কেলাসিত হবার দিকে একটা ঝোঁক থাকে। এইজন্য কাট শিলার ভেতর ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো কেলাস তৈরি হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে কাচ-কেলাসীভবন বা ডিভিট্রিফিকেশান (devitrifciation) বলে। কার্বনিফেরাস যুগের আগের কোনো যুগে কাচ আগ্নেয় শিলা দেখা যায় না। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে, যথেষ্ট সময় পেলে কাচ শিলায় স্বতঃপ্রণোদিত কেলাস তৈরি হয়। এরকম কাচ শিলার মধ্যে ছোট ছোট খনিজ কেলাস তৈরি হলে তাকে ফেলসিটিক গ্রথন ও এই ধরনের শিলাকে ফেলসাইট (Felsite) বলা হয়। অবশ্য, অনেক সময় হালকা রঙের রায়োলাইট ও অ্যান্ডেসাইট শিলায় ফেনোকৃস্টের অভাবের জন্য এদের পৃথকীকরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং এদের বিশেষ পরিচিত উহ্য রেখে সাধারণভাবে ফেলসাইট বলা হয়। পরফিরি গ্রথনে বড় বড় কেলাসগুলোকে বলা হয় ফেনোকৃস্ট। এই ফেনোকৃস্টগুলোর চারধারে পাথরের মধ্যে যে স্থান বা জমি থাকে তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কেলাস বা কাচ দিয়ে ভর্তি থাকে।

ম্যাগমার শীতলীভবনের হার ও ম্যাগমার মধ্যে দ্রবীভূত গ্যাসের পরিমাণ ও ম্যাগমার প্রকৃতি আগ্নেয় শিলার গ্রথনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে শীতলীভবনের হারই প্রধান। যদি ম্যাগমা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয় তাহলে কেলাস দানা বড় হয়। অতি উত্তপ্ত অবস্থায় ম্যাগমার ভেতরের মৌলের অণুগুলো সংগঠিত হয়ে কেলাস গঠন করতে পারে না, কিন্তু এই ম্যাগমা ঠান্ডা হয়ে একসময় এমন এক তাপমাত্রায় উপনীত হয় যখন ঐ ম্যাগমা থেকে খনিজ কেলাস তৈরি হতে থাকে। এই অবস্থায় ম্যাগমা যদি খুব ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়, তাহলে ম্যাগমার সান্দ্রতা তেমন বাড়ে না ও প্রতিটি খনিজের কেলাসগুলি গঠিত ও বড় হবার সুযোগ পায়। অপরপক্ষে ম্যাগমা দ্রুত ঠান্ডা হলে ম্যাগমার সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় ও

খনিজ কেলাসগুলোকে বড় হতে বাধা দেয় ও সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট গ্রথনের উদ্ভব ঘটায়। প্রথম ক্ষেত্রে ফ্যানেরিটিক ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অ্যাফিনিটিক গ্রথনের সৃষ্টি হয়। অতি দ্রুত শীতলীভবন দানাহীন কাচের সৃষ্টি করে। পরফিরিটিক গ্রথনে ফেনোকৃস্টগুলো ভূগর্ভের গভীর অঞ্চলে ম্যাগমা থেকে কেলাসিত হয়। সেখানে উচ্চচাপের মধ্যে ধীরে ধীরে কেলাস তৈরি হতে থাকে বলে এগুলো বেশ বড় হতে পারে। তারপর ঐ বড় কেলাস সমেত ম্যাগমা যদি ভূগর্ভের অ-গভীর অংশে বা ভূ-পৃষ্ঠে হঠাৎ এসে পৌঁছয় তাহলে ম্যাগমার ওপর চাপ কমে যায়, উদ্বায়ী পদার্থের বহুলাংশে নিষ্ক্রমণ হয় ও ম্যাগমা সান্দ্র হয়ে পড়ে। ফলে পরিশিষ্ট ম্যাগমায় অসংখ্য ছোট কেলাস ও কাচও তৈরি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ম্যাগমার মধ্যে গ্যাসের পরিমাণ বেশি থাকলে ম্যাগমার সান্দ্রতা কমে।

ম্যাগমার শীতলীভবন হার ও দ্রবীভূত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ নির্ভর করে ম্যাগমার উৎপত্তিস্থল ও ম্যাগমা সঞ্চয়ের আয়তনের ওপর। উদ্বেধী শিলার ক্ষেত্রে ম্যাগমা সঞ্চয়ের ওপর শিলার আবরণ থাকে। শিলা তাপের কুপরিবাহী বলে গলিত ম্যাগমা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়। এছাড়া বর্ধিত চাপের প্রভাবে বেশি পরিমাণ গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ফলে ম্যাগমা কম সান্দ্র থাকে এবং খনিজ কেলাসগুলো গঠিত হবার সুযোগ পায়। অপরপক্ষে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর ম্যাগমা উপনীত হলে এর ওপর শিলার আবরণ না থাকায় অধিকাংশ গ্যাস বের হয়ে যায় ও ম্যাগমা দ্রুত শীতল হয় এবং অ্যাফিনিটিক বা কাচ জাতীয় গ্রথনের সৃষ্টি হয়।

উদ্বেধী শিলার আয়তনও ম্যাগমার শীতলীভবন হারকে প্রভাবিত করে। সুবৃহৎ ব্যাথোলিথের সঙ্গে জড়িত ম্যাগমা অভ্যন্তরভাগে খুব ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়। এইজন্য ব্যাথোলিথের সঙ্গে ফ্যানেরাইট জাতীয় শিলা জড়িত থাকতে দেখা যায়। অধিকাংশ ব্যাথোলিথই ফ্যানেরাইট জাতীয় গ্রানাইট পাথরে তৈরি হতে দেখা যায়। ল্যাকোলিথ, ফ্যাকোলিথ, ডাইক, সিল প্রভৃতি উপ-পাতালিক শিলাদেহের ক্ষেত্রে সাধারণত পরফিরিটিক গ্রথন দেখা যায়। প্রাথমিক পর্বে গভীর অঞ্চলে কিছু ফেনোকৃস্ট তৈরি হবার পর ম্যাগমার দ্রুত উত্থান ঘটে ও অগভীর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঠান্ডা হয়ে ফেনোকৃস্টের চারধারে ক্ষুদ্র খনিজ কেলাস বা কাচের সৃষ্টি করে। ডাইকের সঙ্গে সাধারণত পরিফিরিটিক শিলা গ্রথন জড়িত থাকলেও অনেক সময় ডাইকে খনিজের বেশ বড় দানা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এরকম স্থূল দানাবিশিষ্ট শিলাকে পেগমাটাইট (Pegmatite) বলে। যদিও অধিকাংশ পেগমাটাইটের কেলাস দৈর্ঘ্য কয়েক সেমি'র কম থাকে, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেলাসগুলো কয়েক মিটার লম্বা হতে পারে। বিহারে হাজারীবাগ অঞ্চলে পেগমাটাইট পাথরে বড় বড় অভ্রের কেলাস পাওয়া যায় যা এই অঞ্চলকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অভ্রখনিতে পরিণত করেছে। পেগাটাইটের উৎপত্তি এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। দেখা গেছে, কোনও ব্যাথোলিথ বা স্টক থেকে বহির্গত ডাইকের সঙ্গে পেগমাটাইট জড়িত থাকে, আর পেগমাটাইটের খনিজ সমবায় ঐ ব্যাথোলিথ বা স্টকের অনুরূপ হয়ে থাকে। ও. এফ. টাটল (O. F. Tuttle) এবং এন. এল. বাওয়েন (N. L. Bowen) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ম্যাগমায় বেশি পরিমাণ অ্যালকালি ও সিলিকা থাকলে জল বেশি পরিমাণ ম্যাগমায় মিশতে পারে। ফলে এই ম্যাগমা 600° সে. এরও কম তাপাঙ্কে তরল অবস্থায় থাকতে পারে। এরকম জলসমৃদ্ধ ম্যাগমা থেকে নিচু তাপাঙ্কে পেগমাইট তৈরি হতে পারে। আর. এইচ. জন্‌স্ ও সি. ডব্লু. বার্নহাম পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, গ্রানাইট শিলার গলনে জল থাকলে কিছু কেলাসনের পর অবশিষ্ট গলনের মধ্যে জলের অনুপাত বাড়তে থাকে ও তার

ফলে এক সময় বাষ্পসমৃদ্ধ গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই সময় কোয়ার্টজ, ফেলস্পার ইত্যাদির বড় কেলাস তৈরি হয়। কিন্তু চাপ বেশি থাকলে জলসমৃদ্ধ পদার্থ আলাদা হবার সুযোগ পায় না ও কেলাসিত পদার্থ চিনির মত দানাযুক্ত অ্যাপলিটিক গ্রথন (Aplitic texture) তৈরি করে। রূপান্তরিত শিলাতেও পেগমাটাইট তৈরি হতে পারে।

ম্যাগমার শীতলীভবনের হার, সান্দ্রতা ও দ্রবীভূত বায়বীয় পদার্থের পরিমাণ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিলার গ্রথনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে—যেমন কিছু কিছু খনিজ (উদাহরণ : অলিভিন) কখনই বড় কেলাস তৈরি করে না।

নিঃসারী ম্যাগমার মধ্যস্থ গ্যাস নিষ্ক্রমণকালে অনেক সময় প্রায় গোলাকার বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি হয় ও বুদ্‌বুদ্ ফেটে যাবার পর একরকম গর্তযুক্ত শিলার উদ্ভব ঘটে। একে ভেসিকুলার আগ্নেয়শিলা বলে। অনেকসময় এরকম গর্ত বা শূন্যস্থান পরবর্তীকালে গৌণ খনিজ কেলাস দিয়ে পূর্ণ হয়। এরকম শিলাকে অ্যামিগ্‌ড্যালয়ডাল (Amygdaloidal) আগ্নেয় শিলা বলে। সাধারণতঃ অনিয়তকার সিলিকা গঠিত অ্যাগেট (Agate), চ্যালসিডনি (Chalcedony) বা ওপ্যাল (Opal) দিয়ে অ্যামিগ্‌ড্যালয়ডাল শিলার গর্তগুলো পূর্ণ থাকে। নিঃসারী লাভার উপরিভাগে গ্যাস নিষ্ক্রমণকালে যে ফেনার সৃষ্টি হয়, তা থেকে জলের চেয়েও হালকা পিউমিস্ (Pumice) শিলার সৃষ্টি হয়।

(c) রাসায়নিক সংযুতি হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ঃ আগ্নেয় শিলা বিভিন্ন খনিজ সমবায়ে গঠিত হয়ে থাকে। যেমন গ্রানাইট পাথরে অর্থোক্লেজ, কোয়ার্টজ এবং কিছু পরিমাণে বায়োটাইট, হর্ণব্লেণ্ড, টুরমালিন প্রভৃতি খনিজের সমাবেশ ঘটে। অনেক সময় বিভিন্ন খনিজের সমবায় উল্লেখ না কলেও কোনও আগ্নেয় শিলার রাসায়নিক সংযুতি সিলিকার শতকরা ভাগ দিয়ে প্রকাশিত হয়। 1900 সাল থেকে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে একটা খনিজের রাসায়নিক সংযুতি বিভিন্ন মৌলের অক্সাইড রূপে প্রকাশ করে সিলিকার (SiO_2) শতকরা হার নির্ণয় করা হয়। যেমন, অর্থোক্লেজ ফেলস্পারকে নিম্নলিখিত অক্সাইডের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায় :

$$2KAlSi_3O_8 \rightleftharpoons K_2O+Al_2O_3 + 6SiO_2$$

অন্যান্য সিলিকেটকেও এরকম বিভিন্ন অক্সাইডের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায়। এখন, কোনও আগ্নেয় শিলায় যে যে সিলিকেট খনিজগুলো বর্তমান রয়েছে, তাদের ওজনগত অনুপাত ও প্রত্যেক খনিজের রাসায়নিক ফর্মূলা থেকে এর মধ্যে সিলিকার অনুপাত নির্ণয় করে ঐ শিলায় সিলিকার শতকরা ভাগ নির্ণয় করা যায়। সাধারণত আগ্নেয় শিলায় শতকরা 35 থেকে 80 ভাগের মত সিলিকা থাকে। যে সমস্ত আগ্নেয় শিলায় সিলিকার ভাগ 45% থেকে 52% থাকে, তাদের ক্ষারকীয় (Basic) আগ্নেয় শিলা বলে। সিলিকার ভাগ 45% এর কম হলে অতিক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত আগ্নেয় শিলায় সিলিকার শতকরা ভাগ 52-66% থাকে, তাদের মধ্যবর্তী (Intermediate) ও যে সমস্ত আগ্নেয় শিলায় সিলিকার শতকরা ভাগ 66% এর বেশি থাকে, তাদের আম্লিক (Acidic) আগ্নেয় শিলা বলে। সাধারণত হালকা রঙের খনিজ ফেলস্পার, কোয়ার্টাজ প্রভৃতিতে সিলিকার ভাগ বেশি থাকে বলে হালকা রঙের আগ্নেয় শিলা আম্লিক ধরনের ও গাঢ় রঙের শিলা ক্ষারকীয় ধরনের হয়ে থাকে। তবে এই কথা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না—যেমন চার্নকাইট, রায়োলাইট শিলা। সিলিকার ভাগ লাভার সান্দ্রতার

ওপর প্রভাব বিস্তার করে। লাভায় সিলিকার যত বেশি বাড়ে, তত এটা বেশি সান্দ্র হয়ে পড়ে। অগ্নুৎপাতের প্রকৃতি, উদ্বেধী আগ্নেয় শিলার সঞ্চয়রূপ ও শিলা গ্রথনে লাভা বা ম্যাগমার সান্দ্রতা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এই প্রসঙ্গে আগেই আলোচিত হয়েছে।

আগ্নেয় শিলায় সিলিকা ও অন্যান্য অক্সাইডের শতকরা ভাগ থেকে আমরা কিন্তু কোনও আগ্নেয় শিলার নমুনায় খনিজের যথার্থ সমবায় সম্পর্ক সম্যক ধারণা করতে পারি না। এখানে বলা দরকার যে, আগ্নেয় শিলায় খনিজের সংখ্যাও যেমন সীমিত, তেমনি খনিজ সমবায় ও ওদের পারস্পরিক অনুপাত অল্পকয়েক প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে উপরোক্ত অবস্থা উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ঘটেছে। যখন কোনও গলিত সিলিকেট থেকে কেলাসিত হয়ে আগ্নেয় শিলা তৈরি হয়, তখন কেলাসনের নিয়মগুলো ভৌত রসায়নবিদ্যা থেকে কিছুটা বোঝা গেছে এবং এটাই আগ্নেয় শিলার সীমিত রাসায়নিক সংযুতির যুক্তিসঙ্গাত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে।

এই প্রসঙ্গে ম্যাগমা গলন থেকে কেলাস সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইউটেকটিক সূত্র (Eutectic law) উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইউটেকটিক হল দুই বা ততোধিক পদার্থের মিশ্রিত গলন যার বিভিন্ন উপাদানগুলোর ওজনগত অনুপাত এমন থাকবে যে, এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম তাপমাত্রায় উপাদানগুলোর কেলাস একই সঙ্গে পড়বে (চিত্র : 6.5)। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করা যাক, সীসা (গলনাঙ্ক 326° সে.) এবং রুপোর (গলনাঙ্ক 954° সে.) এক গলনে সীসা ও রূপোর ওজন অনুপাত 96 ও 4 এবং 260° সে.-এ এই গলন থেকে সীসা ও রূপো একই সঙ্গে কেলাস গঠন করল। এই ধরনের মিশ্রণকে আমরা ইউটেকটিক মিশ্রণ বলব। গলিত মিশ্রণে ইউটেকটিক অনুপাত ছাড়া অন্য যে কোনও অনুপাত থাকলে পদার্থের কেলাস একই সঙ্গে হবে না। এরকম গলিত মিশ্রণ ঠাণ্ডা হবার সময় ইউটেকটিক তাপমাত্রায় আসবার আগেই মিশ্রণ যে পদার্থের পরিমান ইউটেকটিক মিশ্রণের অনুপাত থেকে বেশি আছে, সেই পদার্থের প্রথমে কেলাস সৃষ্টি হবে। অবশিষ্ট তরলে ঐ পদার্থের অনুপাত

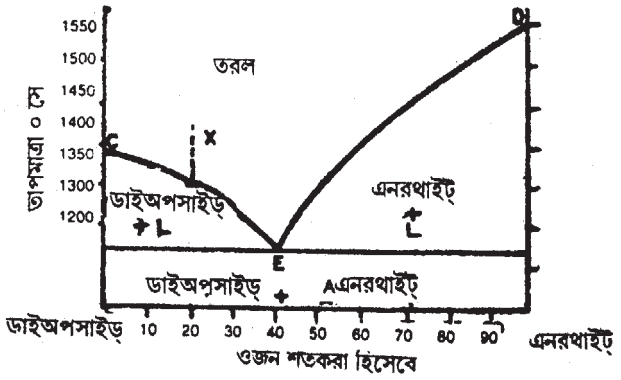

চিত্র 6.5 : *তাপমাত্রা উপাদান অনুপাত সম্পর্কিত দশা পরিবর্তনের চিত্র ডাইঅপ্সাইড অ্যানর্থাইট বর্গ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। X (1391° সে.) শুধু ডাইঅপ্সাইডের গলনাঙ্ক; D (1550° সে.) অ্যানর্থাইটের গলনাঙ্ক; E হল ইউটেকটিক বিন্দু (1274° সে.); এই বিন্দুতে গলনের সংযুক্তি হ'ল ডাইঅপ্সাইড 58% ও অ্যানর্থাইট 42%।*

কমতে থাকবে ও একসময় মিশ্রণে পদার্থের অনুপাত ইউটেকটিক বিন্দুতে পৌঁছাবে এবং এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম তাপমাত্রায় একসঙ্গে ঐ পদার্থগুলোর কেলাস গঠন হবে। ম্যাগমার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলগুলো যখন শিলা খনিজের কেলাস গঠন করে তখন ওপরের অবস্থা সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে ইউটেকটিক মিশ্রণযুক্ত কঠিনকে উত্তপ্ত করলে ঘটনার গতি বিপরীতমুখী হবে। ইউটেকটিক বিন্দু তাপমাত্রায় কিছু পদার্থ গলবে এবং গলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইউটেকটিক অনুপাত বজায় থাকবে। এমন কিছু কিছু পদার্থের গলনের পর তাকে নিংড়িয়ে বার করে নিলেও অবশিষ্ট কঠিনে ইউটেকটিক অনুপাতের হেরফের হবে না এবং এক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত ইউটেকটিক অনুপাত থেকে যাবে। অনুরূপ অসম্পূর্ণ গলনকে আংশিক গলন (Partial melting) বলে। প্রকৃতিতে ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট এরকম ইউটেকটিক মিশ্রণ। যদি কোনও কারণে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও পটাশিয়াম সমন্বিত গ্রানাইট গভীর ভূ-অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হয়, তাহলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও উদ্ভূত তাপের ফলে এক সময়ে গ্রানাইট গলে যায় ও এই গলন ইউটেকটিক থাকে বলে ঐ গ্রানাইট ওপরে উঠে এসে অপেক্ষাকৃত অগভীর অঞ্চলে সঞ্চিত হলে কঠিন হয়ে আবার উদ্বেধী গ্রানাইট শিলা তৈরি করে।

ইউটেকটিক নয় এমন গলিত পদার্থের মিশ্রণকে যদি ঠাণ্ডা করা যায়, তাহলে প্রথমে যে কেলাস সৃষ্টি হবে তা এ মিশ্রণকে ইউটেকটিক বিন্দুতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। উৎপন্ন কেলাস তরলের নীচে থিতিয়ে পড়লে তরলের গঠন ইউটেকটিক ধরনের হবে, কিন্তু কঠিনের গঠন ইউটেকটিক থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। এই প্রক্রিয়াকে আংশিক কেলাসন (Partial Crystallisation) বলে। একে এক ধরনের ম্যাগমা অবকলন (Magmatic differentiation) বলে ও এর ফলে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয় শিলার কেলাস সমবায়ের পার্থক্য ঘটতে পারে। আফ্রিকার বুশভেল্ডে (Bushveld) স্তর সমন্বিত ব্যাসল্ট জাতীয় শিলার কঠিনীভবনের শেষ পর্যায়ে সিলিকা সমৃদ্ধ গ্রানাইট জাতীয় শিলা দেখা যায়। অবশ্য এই গ্রানাইটে আদর্শ গ্রানাইট থেকে সিলিকার ভাগ কম থাকে। এই পদ্ধতিতে ব্যাসল্ট থেকে শতকরা 10 ভাগ গ্রানাইট তৈরি হতে পারে কিন্তু ভূতত্ত্ববিদরা ব্যাসল্ট ও গ্রানাইটের এরকম অনুপাত কোথাও দেখতে পাননি। কাজেই এইভাবে মহাদেশীয় গ্রানাইটের উৎপত্তি মেনে নেওয়া যাবে কি?

বাওয়েনের বিক্রিয়াক্রম (The Bowen Reaction Series) ঃ এই শতকের প্রারম্ভে নর্মান লেভি বাওয়েন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে সিলিকেট খনিজের এক বিক্রিয়াক্রমে তৈরি করেন। গ্রানাইট পাথরের উৎপত্তির ব্যাখ্যার জন্যই এই পরীক্ষা করা হয়। যদিও গ্রানাইটের উৎপত্তি সম্পর্কে বাওয়েনের ধারণা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলেও এই ক্রম শিলা খনিজের কেলাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু সুসম্বন্ধ তথ্য উপস্থাপিত করে।

বাওয়েন মূলত শিলা উৎপানকারী খনিজগুলিকে ক্রমনিম্নমান গলনাঙ্ক অনুসারে সাজিয়ে তালিকা প্রস্তুত করেন। ম্যাগমা যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন উচ্চতম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট খনিজ সবচেয়ে প্রথম ও অন্যান্য খনিজগুলো ক্রমনিম্নমান গলনাঙ্ক অনুসারে পর পর কঠিন হবে। বাওয়েন সিলিকেট খনিজগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একভাগে রয়েছে হাল্কা রঙের খনিজগুলো, আর অন্যভাগে রয়েছে গাঢ় রঙের খনিজগুলো। গাঢ় রঙের সিলিকা চতুস্তলক খনিজ, একক ও দ্বি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ খনিজ, পাত জাতীয় খনিজ কেলাসের গঠনের পার্থক্য অনুযায়ী ঠাণ্ডা হবার সময় গলনে প্রথমে অলিভিন (চতুস্তলক খনিজ)

ও ক্রমে-ক্রমে পাইরক্সিন (একক শৃঙ্খলাবদ্ধ খনিজ), অ্যাম্ফিবোল (দ্বি-শৃঙ্খলাবদ্ধ খনিজ), বায়োটাইটের (পাতজাতীয় খনিজ) গলনাঙ্ক ধপে ধাপে ক্রমে। হালকা রঙের খনিজগুলোর গলনের ক্ষেত্রে প্লাজিওক্লেজ ফেলস্পারের (কঠিন দ্রবণ জাতীয় খনিজ) ক্যালসিয়াম ঘটিত অ্যানর্থাইট কঠিন হয়। গলনের ক্রম শীতলীভবনকালে প্রথম ভাগের বায়োটাইট ও দ্বিতীয় ভাগের অ্যালবাইটের পর অর্থোক্লেজ ফেলস্পার (পটাশ ফেলস্পার) ও এরপরে মাসকোভাইট ও সবশেষে কোয়ার্টজ কেলাসিত হয় (চিত্র ঃ 6.6)।

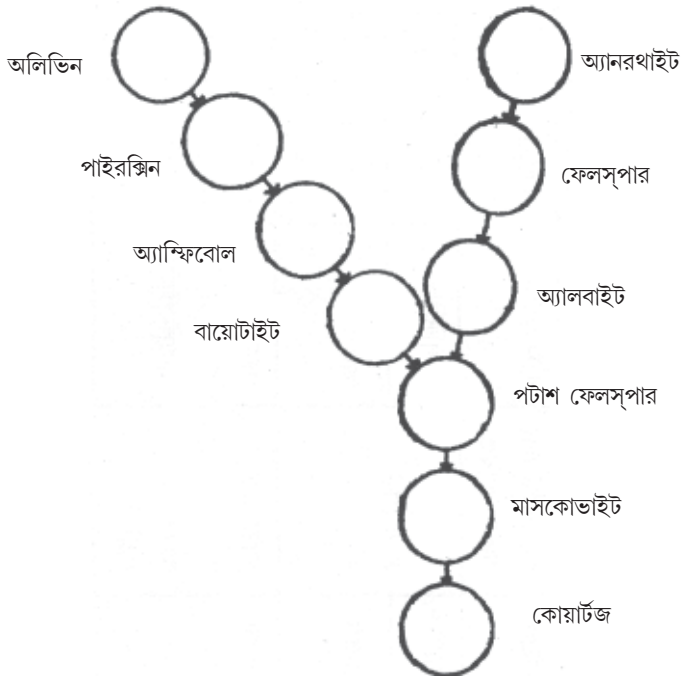

চিত্র 6.6 : *খকিনজের আদর্শ মিশ্রণযুক্ত ম্যাগমা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হলে বিভিন্ন খনিজের কেলাস সৃষ্টির অনুক্রম (বাওয়েনের বিক্রিয়া ক্রম অনুযায়ী)।*

গলনাঙ্কের ভিত্তিতে সিলিকেট খনিজের এই ক্রমবিন্যাসকে বাওয়েন বিক্রিয়া বলা হয় এই কারণে যে, বাওয়েন মনে করতে যে, তালিকার ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনও কোনও খনিজ অবশিষ্ট ম্যাগমার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে পরবর্তী নিম্নধাপের খনিজ সৃষ্টি করতে পারে। বাওয়েনের মতে, আংশিক কেলাসনের (partial crystallisation) মত কোনও ম্যাগমা ঠাণ্ডা হবার কালে প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম সিলিকা সমৃদ্ধ গাঢ় রঙের খনিজগুলোর কেলাস গঠিত হবে ও ভারী বলে এরা গলনে ডুবে যাবে ও ম্যাগমায় সিলিকার সমৃদ্ধি ঘটবে এবং সবচেয়ে শেষে সিলিকা সমৃদ্ধ গ্রানাইট বা পেগমাটাইট পাথরের সৃষ্টি হবে।

আগ্নেয় শিলায় রাসায়নিক গঠনের বিভিন্নতার মূলে উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের ম্যাগমা অবকলন (magmatic differentiation) কার্য করে বলে মনে করা হয়, কিন্তু প্রাথমিক ম্যাগমার রাসায়নিক সংযুতি সবক্ষেত্রে একইরকম থাকে অথবা এটা বিভিন্ন রকম হতে পারে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা রয়ে গেছে।

আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ সারণীর আকারে দেওয়া হল (সারণী ঃ 6.2)।

সারণী 6.2

আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ							
হালকা রঙের খনিজের প্রাধান্য <——————————> গাঢ় রঙের খনিজের প্রাধান্য							
উৎপত্তিস্থল	বুনন বা গ্রথন	খনিজ সমবায় ও রাসায়নিক সংযুতি					
		আম্লিক	মধ্যবর্তী	মধ্যবর্তী	ক্ষারকীয়		অতিক্ষারকীয়
		অর্থক্লেজ ফেলস্পার প্রধান		সোডিয়াম প্লাজিওক্লেজ ফেলস্পার প্রধান	ক্যালসিয়াম প্লাজিওক্লেজ ফেলস্পার প্রধান		ফেলস্পার নেই
		+ বায়োটাইট + হর্ণব্লেণ্ড		বায়োটাইট এবং অথবা হর্ণব্লেণ্ড	পাইরক্সিন প্রধানত অগাইট		সম্পূর্ণাংশ গাঢ় রঙের খনিজ
		+ কোয়ার্টজ	- কোয়ার্টজ	ডায়োরাইট	- অলিভিন	+ অলিভিন	পেরিডোটাইট (বিভিন্ন গাঢ় রঙের খনিজের সমষ্টি); হর্ণব্লেণ্ডাইট (প্রায় সম্পূর্ণাংশ হর্ণব্লেণ্ড গঠিত); পাইরক্সিনাইট (প্রায় সম্পূর্ণাংশ পাইরক্সিন খনিজ গঠিত)।
ব্যাথেলিফ, কিছু কিছু ল্যাকোলিথ ও ফ্যাকোলিথ	ফ্যানেরিটিক	গ্রানাইট	সায়েনাইট		গ্যাব্রো	অলিভিন গ্র্যাব্রো	
কিছু কিছু ল্যাকোলিথ, ফ্যাকোলিথ ও ডাইক্, সিল, সিট	পরফিরিটিক পরফিরিটিক, ফেনোকৃস্ট প্রকট	গ্রানাইট পরফিরি রায়োলাইট পরফিরি	সায়েনাইট পরফিরি ট্র্যাকাইট পরফিরি	ডায়োরাইট পরফিরি অ্যাণ্ডেসাইট পরফিরি	গ্যাব্রো পরফিরি ব্যাসল্ট পরফিরি	অলিভিন গ্যাব্রো পরফিরি অলিভিন ব্যাসল্ট পরফিরি	
ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত	কাচ, ফেলসিটিক	রায়োলাইট	ট্র্যাকাইট	অ্যাণ্ডেসাইট	ব্যাসল্ট	অলিভিন ব্যাসল্ট	
বিস্ফোরণমূলক অগ্ন্যুৎপাত	পাইরোক্লাস্টিক	টুফ—সিমেন্টপ্রাপ্ত ভস্মজাতীয় পদার্থ গঠিত ব্রেকসিয়া—সিমেন্টপ্রাপ্ত স্থূলশিলাখণ্ড গঠিত					

টীকা ঃ (+) অর্থ যথেস্ট পরিমাণে
(-) অর্থ অল্প পরিমাণে

6.3.2 আগ্নেয় শিলার বণ্টন

বহুদিন পূর্ব থেকেই লক্ষ্য করা গেছে যে, মহাদেশ প্রধানত গ্রানাইট জাতীয় শিলা দিয়ে গঠিত। অপরদিকে লাভা সমভূমি, মধ্য সামুদ্রিক দ্বীপ (যেমন হাওয়াই, আইসল্যান্ড প্রভৃতি) কম সিলিকাসমৃদ্ধ ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দিয়ে গঠিত। সাম্প্রতিক কালের সমীক্ষায় জানা গেছে যে, মহাসমুদ্রের অবক্ষেপের তলায় ভূমিশিলারও প্রায় সম্পূর্ণাংশ ব্যাসল্ট জাতীয়। আবার গভীর সমুদ্র খাতের পাশে মহাদেশের প্রান্তের দিকে আগ্নেয়গিরিগুলো মধ্যবর্তী সিলিকাযুক্ত অ্যান্ডেসাইট শিলা দিয়ে গঠিত। আগ্নেয় শিলার এইরূপ ভৌগোলিক বণ্টন অবশ্যই ব্যাখ্যার দাবি রাখে। প্লেট ভূ-গঠন মতবাদে এর এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

যেখানে দুটো প্লেট একে অপর থেকে দূরে সরে যায়, সেখানে নতুন সমুদ্রপৃষ্ঠের সৃষ্টি হয় এবং গুরুমণ্ডল থেকে আংশিকভাবে গলিত ম্যাগমা প্লেট মধ্যবর্তী ফাঁক পূরণের জন্য ওপরে উঠে আসে। গুরুমণ্ডলে সম্ভাব্য ম্যাগমার প্রকৃতি পেরিডোটাইট ধরনের বলে অনুমান করা হয়। ল্যাবরেটরিতে লার্জোলাইট (Lherzolite) বলে এক ধরনের পেরিডোটাইটকে উচ্চচাপের মধ্যে আংশিক গলিয়ে দেখা গেছে যে, এর থেকে 10-30% ব্যাসল্ট শিলার অনুরূপ গঠনযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়।

যেখানে দুটো প্লেট পরস্পর মিলিত হয়, সেখানে একটা মহাসাগরীয় প্লেট নিম্নগামী হয় ও গুরুমণ্ডলে শোষিত হয়। এরকম মহাসাগরীয় প্লেটের ওপর কর্দম ও বালি সমৃদ্ধ পদার্থ সঞ্চিত হয় ও নিম্নগামী প্লেটের সঙ্গে এই সমস্ত সামুদ্রিক অবক্ষেপ কিছু পরিমাণে গুরমণ্ডলে স্থানান্তরিত হয়। আবার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, পরিমাণ মত উপরোক্ত ধরনের উপকরণের উপস্থিতিতে পরিমার্জিত ব্যাসল্টের আংশিক গলন হলে অ্যান্ডেসাইট জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। গভীর সমুদ্রখাতের পাশে অ্যান্ডেসাইট শিলা গঠিত আগ্নেয়গিরির উৎপত্তিতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

যেখানে দুটো মহাদেশীয় প্লেট পরস্পর মিলিত হয়, সেই অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবারের আগ্নেয় শিলা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে সামুদ্রিক অবক্ষেপ ছাড়াও মহাদেশীয় ভূত্বকও (গ্রানিট) নিম্নগামী হয় এবং গলনের ফলে আরও সিলিকাসমৃদ্ধ শিলার সৃষ্টি হয়। এইজন্য ভঙ্গিল পদার্থের অন্তঃস্থলে ব্যাথোলিথ গ্রানিট শিলা গঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্লেট ভূ-গঠন মতবাদ অনুযায়ী ব্যাসল্টের সঙ্গে অন্যান্য খনিজের মিশ্রণ ও তাদের গলনের ফলে গ্রানিট পাথরের সৃষ্টি এক হিসেবে বাওয়েনের সেই পুরোনো ধারণা—ব্যাসল্ট থেকে গ্রানিট পাথর সৃষ্টি হয়—তাতে ফিরে আসতে সাহায্য করে।

6.4 পাললিক শিলা

পলি গঠিত শিলাকে পাললিক শিলা বলে। পাললিক শিলায় সাধারণত স্তর দেখা যায়। সেইজন্য অনেকসময়ে পাললক শিলাকে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলায় স্তর নাও থাকতে পারে। কাজেই পাললিক ও স্তরীভূত শিলা পাললিক শিলার এক অংশ বিশেষ।

6.4.1 পলির উৎস

ভূ-পৃষ্ঠে পলি নানাভাবে সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পলির প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকার হয়। উৎসের পার্থক্য অনুসারে পলিকে আমরা প্রধান তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(i) সংঘাত পলি : স্থলভাগে বর্তমান শিলা ভেঙেই সংঘাত পলির সৃষ্টি হয়। সংঘাত পলি সৃষ্টির মূলে রয়েছে আবহিক বিকার, চ্যুতিতল বরাবর ঘর্ষণ, বিস্ফোরণমূলক অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি।

(ii) জৈব পলি : সমুদ্রে ছোট, বড় বিভিন্ন প্রাণী বাস করে। এদের অদ্রাব্য দেহাবশেষ সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয় ও এক বিশিষ্ট ধরনের পলির সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ জগৎ ও সংঘাত পলির তলায় চাপা পড়ে অঙ্গারময় পলির সংস্থান করে।

(iii) লবণ : জলীয় দ্রবণ থেকে লবণের সরাসরি অধঃক্ষেপণ একশ্রেণীর পলির সৃষ্টি করে।

এছাড়াও নিম্ন সঞ্চরমান ভৌমজলের সঙ্গে পরিবাহিত বিভিন্ন পদার্থে ঐ মাধ্যমের শিলার সঙ্গে বিক্রিয়া করে বা শিলার অংশকে প্রতিস্থাপিত করেও পলি সঞ্চিত করতে পারে।

6.4.2 পলিশিলীভবন প্রক্রিয়া (Diagenesis)

আলগা পলি থেকে কঠিন শিলায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পলিশিলীভবন বলে। অঙ্গারময় পলি ছাড়া অন্যান্য পলির ক্ষেত্রে শিলীভবন প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত কয়েক ধাপে ভাগ করা যায়। যথা, (i) সংসক্তায়ন (compaction)—উপরিস্থিত পলির চাপে); (ii) নিষ্পীড়ন (syneresis—পলি মধ্যস্থিত জলের আংশিক নিষ্ক্রমণ); (iii) সিমেন্ট প্রাপ্তি (cementation)—এই প্রক্রিয়ায় পলি কণার ফাঁকে ফাঁকে চুন, সিলিকা, লৌহ-অক্সাইড কণা সঞ্চিত হয় ও এতে শিলা জমাট বেঁধে যায়। অনেক সময়, যেমন চুনাপাথরে, সঞ্চরিত ভৌমজলের থেকে অধঃক্ষেপণের ফলে কণার আয়তন বৃদ্ধির পরিমাণ শিলার আয়তনের $^1/_3$ অংশ থেকে $^1/_4$ অংশ পর্যন্ত হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ চাপে ও রাসায়নিক পরিবেশে পলির সিমেন্ট প্রাপ্তি না হয়ে দ্রবণও হতে পারে; (iv) উপক্রান্ত রূপান্তর (incipient metamorphism)—যখন পলি গভীর অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়, তখন উচ্চতর তাপাঙ্ক ও অবরোধী চাপের (confining pressure) মধ্যে শিলার সামান্য রূপান্তর হয়। যেমন, কেওলিনাইট ও মন্টমরিলোনাইট কর্দম খনিজ পরিবর্তিত হয়ে ইল্লাইট কর্দম খনিজ বা ক্লোরাইটে পরিণত হয়। উপক্রান্ত রূপান্তরের চরম পর্যায়ে কর্দম খনিজ নতুনভাবে কেলাসিত হয়ে মাইকা ও সিস্টজাতীয় গ্রথনের সৃষ্টি করতে পারে।

6.4.3.1 পাললিক শিলার গ্রথন, গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

পলি যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই ঐ পলি পরিবাহিত হয়ে অন্য কোথাও জমা হবার পর পাললিক শিলার সৃষ্টি হতে পারে। পরিবহনের মাত্রা, প্রকৃতি, পলির প্রকৃতি প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে পলির কণাগুলোর বাহ্যিক রূপ গড়ে ওঠে। কণার বাহ্যিক রূপ বলতে আমরা সাধারণত তিন ধরনের

মাত্রা ব্যবহার করি, যথা জ্যামিতিক রূপ, গোলীয় মাত্রা (Sphericity) ও উৎকৌণিকতা (Roundness)। কোনও নিয়মিত ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক বস্তুর রূপের সঙ্গে মিলিয়ে কোনও কণার রূপ বর্ণনা করা যেতে পারে। গোলীয় মাত্রায় বলতে কণা কতটা গোলকের কাছে পৌঁছেছে তাকে বোঝায়। কোনও কণার দীর্ঘতম অক্ষ (dn) ও ঐ কণার আয়তনের সমান কোনও গোলকের ব্যাসার্ধের (r) অনুপাতের সাহায্যে সাধারণত গোলীয় মাত্রা পরিমাণ করা যায়। গোলীয় মাত্রা $=\frac{dn}{r}$ এবং এর মান 0 থেকে 1.0 মধ্যে থাকে।

দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে দানার কোণ বা পার্শ্বগুলো কতখানি গোলাকৃতি, তার ওপর দানার যে গুণটি নির্ভর করে তাকে বলে উৎকৌণিকতা (Roundness)।

দ্বি-মাত্রিক ক্ষেত্রে কোনও কণার উৎকৌণিকতা মাপতে ঐ কণার কোণ ও পার্শ্ব দেশের গড় ব্যাসার্ধ (a) এবং ঐ কণার মধ্যে যে বৃহত্তম বৃত্ত আঁকা যায় তার ব্যাসার্ধের অনুপাত (r) দিয়ে আমরা কণার উৎকৌণিকতা মাপতে পারি। অতএব উৎকৌণিকতা = $^{a}/_{r}$ এবং এর মান 0 থেকে 1.0 পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র : 6.7)।

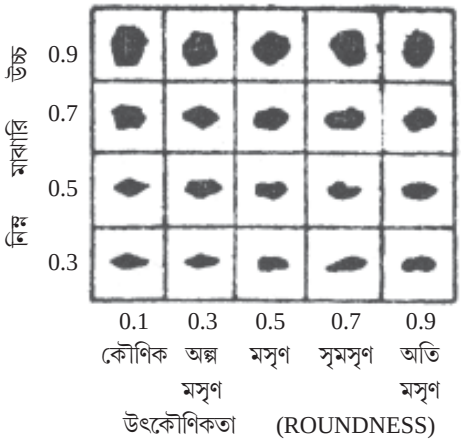

চিত্র 6.07 : *গোলীয় মাত্রা ও উৎকৌণিকতা।*

পলি যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই শিলীভূত হলে পলির কণাগুলো কৌণিক ধরনের হয়। আবহবিকার প্রাপ্ত, অগ্নুৎপাত উৎক্ষিপ্ত বা চ্যুতিতল বরাবর ঘর্ষণজনিত শিলাচূর্ণ শিলীভূত হলে শিলা কণাগুলো কৌণিকই থেকে যায়। এদের আকার দেখে পলির উৎস সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে। পলি পরিবাহিত হয়ে সঞ্চিত হলে ছোট বড় শিলাখণ্ড ভূমির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। পরিবহনের ফলে পলির কণাগুলোর রূপ, উৎকৌণিকতা, গোলীয় মাত্রা কেমন হবে তা বেশ জটিল, তবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে ও বিষয়ে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

(i) কোনও কণা কি পরিমাণ দূরত্ব পরিবাহিত হয়েছে, তার ওপর উৎকৌণিকতা নির্ভর করে। কণা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করলে উৎকৌণিকতার মান বাড়ে ও কম করলে উৎকৌণিকতার মান কম থাকে। পরিবহনকালে ভূমির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কণার গোলীয় রূপ গ্রহণের থেকে উৎকৌণিকতার মান বৃদ্ধি বেশি কার্যকরী হয়।

(ii) বড় শিলাখণ্ড অপেক্ষাকৃত দ্রুত উৎকৌণিকতা প্রাপ্ত হয়। কারণ এরা জলে বেশিক্ষণ প্রলম্বিত থাকতে পারে না। ফলে অবঘর্ষের প্রকোপ থাকে বেশি। পদার্থের যান্ত্রিক কাঠিন্য ও উৎকৌণিকতা প্রাপ্তিতে প্রভাব বিস্তার করে। শক্ত কোয়ার্টজ গঠিত বালি অবঘর্ষের ফলে মসৃণতা পেতে বহু সময় লাগে।

(iii) পরিবহন প্রক্রিয়াও কণার বাহ্যিক রূপের প্রভাব বিস্তার করে। সমুদ্রতরঙ্গ বাহিত কব্‌ল (cobble) চ্যাপ্টা প্রকৃতির হয়। বালি কণার উৎকৌণিকতা বাড়াতে বায়ুজলধারা গায়ে আঁচড় বা দাগ কাটে ও পলির মধ্যে যেকোনও আকারের ও পরিমাপের খণ্ড ও গুঁড়া মিশ্রিত থাকে।

পাললিক শিলার গ্রথনের আর এক বৈশিষ্ট্য হল ছিদ্রতা (Porosity) ও প্রবেশ্যতা (Permeability)। ছিদ্রতা হল শিলার ভেতর খালি জায়গা বা রন্ধ্র পরিসর ও শিলার মোট আয়তনের অনুপাত। ছিদ্র ও ফাটলযুক্ত শিলার মধ্যে তরল বায়ব পদার্থের প্রবাহের মাত্রা বোঝাতে প্রবেশ্যতা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

দানার আকার, দানার গঠন, দানার ঠাস ও দানার বাছাই-এর ওপর শিলার সছিদ্রতা নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, দানার বাছাই যত ভাল হবে প্রবেশ্যতা তত বাড়বে, আর শিলার মধ্যে দানার আকার যত কম-বেশি হয় তত প্রবেশ্যতা কমে।

পাললিক শিলার গঠন (Structure) বিদ্যায় গ্রথনের থেকে বড় বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেমন স্তর, ক্রশবেডিং, লহরী চিহ্ন প্রভৃতি। পাললিক শিলার গঠন বহুলাংশে নির্ভর করে পলি অবক্ষেপণের পরিবেশের উপর।

6.4.3.2 স্তরায়ন

স্তরের উপস্থিতি থেকে পাললিক শিলাকে সহজে চেনা যায়। তবে সব পাললিক শিলায় স্তর থাকে না, যেমন হিমবাহ অবক্ষেপিত টিল বা বায়ু অবক্ষেপিত লোয়েশ। জল থেকে অবক্ষেপিত হলেই স্তরায়ন সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। কাজেই সাগর, উপসাগর, লেগুন, হ্রদ, নদীগর্ভে সঞ্চিত পলিই সাধারণত স্তর যুক্ত হয়। পলির গ্রথন, উপাদান এবং রঙের পার্থক্যই স্তর সৃষ্টিতে সাহায্য করে। (চিত্র : 6.8)। এক সেমি.-এর বেশি বেধযুক্ত স্তরকে অনুস্তর বা বেড (Bed) আর এর কম বেধের স্তরকে ল্যামিনা (Lamina) বা ত্বচ বলে। ত্বচ তৈরির ঘটনাকে ত্বচন বলে। বাগনল্ডের মতে স্তর গঠনে তিনটি প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে।

(i) সাধারণ অধঃক্ষেপণ (Simple sedimentation)—প্রলম্বিত পলির ধীর অবক্ষেপন এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

(ii) উপলেপন (accretion)—পরিবহন মাধ্যমের গতিবেগ, ভূমিতলের মসৃণতা প্রভৃতি পরিবর্তন জনিত অবক্ষেপণ।

(iii) আগ্রাসন (encroachment)—যেমন সঞ্চয়ের ফলে ব-দ্বীপের বিস্তার ঘটে।

** **টীকা :** যদি এক সেন্টিপয়েস সান্দ্র তরল এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মধ্যে এক বর্গ সেমি. প্রস্থচ্ছেদযুক্ত ও এক সেমি. গভীর শিলার মধ্যে দিয়ে প্রতিসেকেন্ডে এক মিলিমিটার ক্ষারিত হয়, তবে তাই হল প্রবেশ্যতার একক ডারসি (Dercy)।*

সাধারণত একটা স্তর বেশ সমসত্ত্ব হয়। তবে সর্বত্র এরকম নাও হতে পারে। যেমন বেলে পাথরের দানাক্রমিক স্তরে (Graded bed) তলার দিকে বড় দানা ও ওপরের দিকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম দানা দেখা যাও

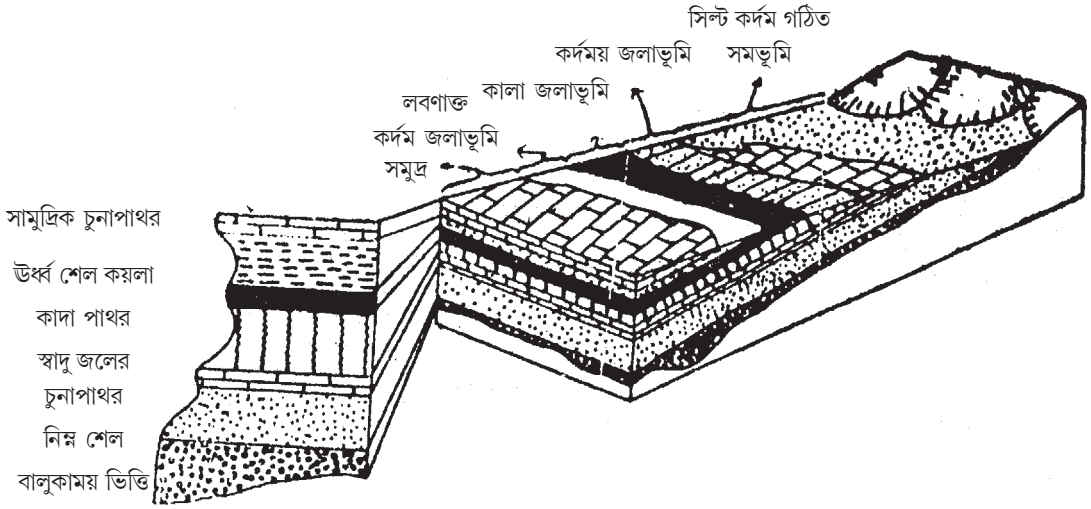

চিত্র 6.8 : *স্তর গঠনের সরল চিত্র।*

ও ওপরের অংশে সূক্ষ্ম দানাযুক্ত শেল পাথর দেখা যায় (চিত্র : 6.9 ও 6.10b)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা স্তরের মধ্যে অন্য রকম রঙ ও গ্রথনযুক্ত পাতলা স্তর বা লেন্স থাকতে পারে। ভারতবর্ষে সিমলা শ্লেট ও গ্রেওয়াকি স্তরে এরকম দানাক্রমিক পলি সঞ্চয় দেখা যায়।

একটা স্তর এক বিশেষ অবস্থায় অবক্ষেপিত হয়, অর্থাৎ আগের স্তর যে অবস্থায় অবক্ষেপিত হয়েছে তার পরিবর্তন ঘটলে তবেই পরবর্তী স্তরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এর থেকে মনে করা যেতে পারে, দুটো স্তর সৃষ্টির প্রক্রিয়া পরিবর্তনের মাঝে অবক্ষেপণে সামান্য সময়ের জন্য এক বিরতি বা যতি থাকে। এর জন্য দুইস্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম হলেও এক ফাঁক থাকে।

স্তর গঠনে কয়েকটা মূল নীতি রয়েছে। (i) সাধারণত গঠনকালে স্তর অনুভূমিকভাবে সৃষ্টি হয়। পরে ভূ-সংক্ষোভের ফলে স্তরের ভঙ্গি পরিবর্তিত হ'তে পারে। (ii) স্তরসজ্জায় একটা কালক্রমিতা অন্তর্নিহিত থাকে। যদি এই স্তরক্রম ভূ-সংক্ষোভের ফলে ব্যতিক্রান্ত (inverted) না হয়ে থাকে, তাহলে সবচেয়ে নিচের স্তরটি প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে ওপরের স্তরটি নবীনতম হবে। (iii) একই যুগের শিলাস্তর ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্রই নির্দিষ্ট জীবাশ্ম (বা জীবাশ্ম গোষ্ঠী) দিয়ে চিহ্নিত হয়। (iv) দুটো সংলগ্ন শিলাস্তরের মধ্যে যখন নতি (Dip) ও আয়াম (Strike) সংক্রান্ত বৈষম্য দেখা যায় তখন এদের বিভেদতলকে অসংগতি বা ব্যুৎক্রম (unconformity) বলা হয়। যে কোনও স্তরক্রমের মধ্যে অসংগতি দিয়ে চিহ্নিত বিভিন্ন শিলা উপাদান দিয়ে গঠিত পাতলা স্তরের সমষ্টিকে সংঘ (Formation) বলে। সংঘের উপরিভাগ যথাক্রমে

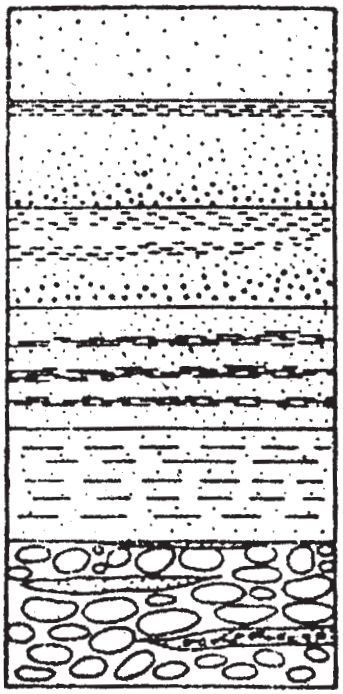

চিত্র 6.9 : *বিভিন্ন রকম স্তরায়নের উদাহরণ। A, E সমসত্ত্বতাযুক্ত স্তরায়ন; B, C দানাক্রমিক স্তরায়ন; D বেলেপাথরের স্তরের মধ্যে শেলের পাতলা স্তর; F কংগ্লোমারেট স্তরের মধ্যে বেলে পাথরের লেন্স।*

সভ্য (Member), অনুস্তর (Bed) প্রভৃতি। (v) একই শিলাস্তরের পার্শ্বিক বিস্তৃতির দিকে স্থান থেকে স্থানান্তরে গেলে শিলাপ্রকৃতি অল্পবিস্তর মাত্রায় পরিবর্তিত হচ্ছে দেখা যায়। পাশের দিকে একই শিলাস্তর এই যে রূপভেদ (Lateral change of Facies)-এর অন্তর্নিহিত কারণ হল প্রাকৃতিক প্রতিবেশের তারতম্য (চিত্র : 6.8)। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সমুদ্রতীর থেকে যতই গভীর সমুদ্রের দিকে যাওয়া যায়, পলি অবক্ষেপনের প্রকৃতির ততই পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে মোটা দানার বালি, তারপর কাদা মেশানো বালি ও আরও পরে কাদার অবক্ষেপণ হবে। এইভাবে একই স্তরের মধ্যে পাললিক রূপভেদ (Sedimentary Facies) সৃষ্টি হয়। পাললিক শিলার রঙ, গঠন, উপাদান, গ্রথন, জীবাশ্ম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলোর একক বা একাধিক পরিবর্তনের সাহায্যে রূপভেদ শনাক্ত করা যায়।

তির্যক ত্বচন (Cross Lamination) : অনেক সময় কোন স্তরে স্তরায়ন তলের সঙ্গে হেলানো অবস্থায় অনেক উপস্তর দেখতে পাওয়া যায়। একে তির্যক ত্বচন বলে (চিত্র : 6.10a)। তির্যক ত্বচন থেকে একটা স্তরকে অন্য স্তর থেকে আলাদা করে চেনা যায়। পলি মেশানো বায়ু বা জলস্রোত যখন আগের সঞ্চয়ের ঢালের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তির্যকতলের ওপর নতুন পলি অবক্ষেপিত হয় ও এটা সাধারণ স্তরায়ন তলের সঙ্গে হেলানো অবস্থায় থাকে। এইভাবে তির্যক ত্বচনের সৃষ্টি হয়।

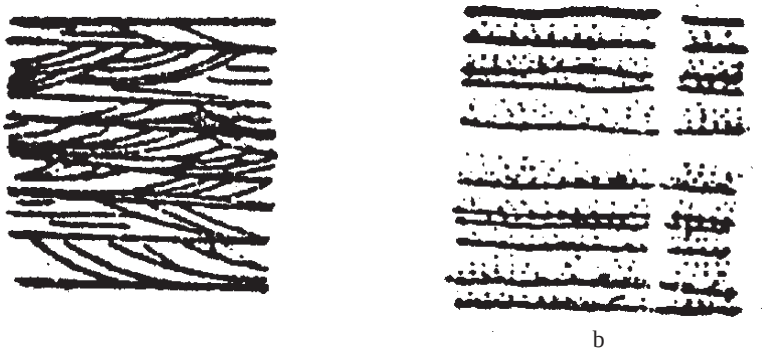

চিত্র 6.10 : *বেলেপাথরে প্রধান দুই প্রকার গঠনের বিশেষত্ব। a—তির্যক ত্বচন (যেমন অর্থোকোয়ার্টজাইট পাথরে থাকে)। b—দানাক্রমিক স্তরায়ন (যেমন গ্রেওয়াকি পাথরে থাকে)।*

6.4.3.3 ভার্ব (Verve)

শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুভেদে হ্রদের জল থেকে অবক্ষেপণের পার্থক্যের জন্য দুটো ত্বচের সৃষ্টি হতে পারে। এক বছরে সঞ্চিত দুটো ত্বচ মিলে একটা ভার্ব তৈরি হয়। হিমবাহ অঞ্চলের হ্রদের জলে এরকম ত্বচের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে বরফগলা জল হ্রদে এসে পড়ে ও তার থেকে বড় দানাযুক্ত অংশ সঙ্গে সঙ্গে অবক্ষেপিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দানাযুক্ত অংশ জলে প্রলম্বিত থাকে। শীতকালে যখন উপরিভাগের জল জমে বরফ হয়, তখন তার তলায় জল থেকে সূক্ষ্ম কণাগুলো ধীরে ধীরে নেমে অবক্ষেপিত হয়। এইভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম দানাযুক্ত দুটো ত্বচ নিয়ে একটা ভার্ব তৈরি হয়। এভাবে অনেক ভার্ব তৈরি হতে পারে। ভারতবর্ষে গন্ডোয়ানা যুগের তালচের সংঘের (Formation) শিলায় এরকম ভার্ব দেখতে পাওয়া যায়।

6.4.3.4 কাদার ফাটল (Mud cracks)

জলের মধ্যে কাদার স্তরের অবক্ষেপণের পর যখন কিছু সময়ের জন্য ঐ স্তরের ওপর জল থাকে না এবং ঐ কাদা যখন শুকোতে থাকে তখন কাদার স্তরে পাঁচ-ছয় বাহু বিশিষ্ট ফাটল সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে পলি সঞ্চয়ের সময় ঐ ফাঁক বালি দিয়ে ভর্তি হয়ে যায় ও কাদার ফাটলের স্থায়ী চিহ্ন থেকে যায় (চিত্র : 6.11)।

চিত্র 6.11 : *কাদার ফাটল (Mud cracks)।*

6.4.3.5 বৃষ্টির চিহ্ন (Rain prints)

বৃষ্টির জলের ফোঁটার ছাপ বালির স্তরের ওপর থেকে যায়। যদি ঐ ছাপ নষ্ট হবার আগেই নতুন পলির অবক্ষেপণ হয় তাহলে ঐ ছাপ স্থায়ীভাবে শিলাস্তরে থেকে যায়।

6.4.3.6 লহরী চিহ্ন (Ripple mark)

যখন জলস্রোত জলের তলার পলির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন স্রোতের আড়াআড়ি দিকে অসংখ্য সমান্তরাল শিরার মত উচ্চ অংশের সৃষ্টি হয়। পুকুরের জলে ওপরে সৃষ্ট ছোট ছোট ঢেউ-এর মত এদেরকে দেখায়। এদের লহরী চিহ্ন বলে (চিত্র : 6.12)। সাধারণত বালি ও সিল্টের ওপর এই ধরনের লহরী চিহ্ন সৃষ্টি হয়। সাময়িকভাবে জল সরে যাওয়ার পর পলি শুকিয়ে গেলে এই লহরী চিহ্ন থেকে যায়। পরবর্তীকালে এর ওপর নতুন করে পলি জমলেও এই চিহ্ন নষ্ট হয় না।

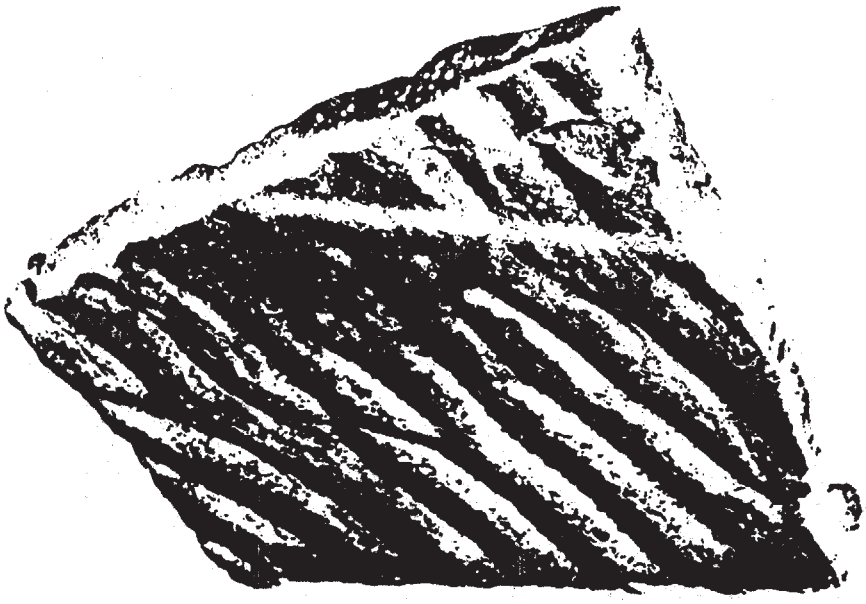

চিত্র 6.12 : *লহরী চিহ্ন (Ripple mark)।*

6.4.3.7 জীবাশ্ম (Fossil)

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পলির তলায় চাপা পড়া অবস্থায় প্রাচীন জীবের অস্তিত্ব লক্ষণ বা চিহ্নকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে। প্রাচীন কঙ্কাল, ছাপ বা ছাঁচ, দেহ নিঃসৃত পদার্থ, চলার দাগ প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধুমাত্র পাললিক শিলাতেই জীবাশ্ম দেখা যায়। জীবের দেহ পচনের ফলে বিনষ্ট হয় ও সঞ্চরিত ভৌমজলের সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু গলিত ঐ অংশে ভৌমজল পরিবাহিত অজৈব পদার্থ সঞ্চিত

হয়ে ঐ জীবজন্তু বা উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত ছাঁচ বা ছাপ থেকে যায়। প্রাণীর চলার পথের দাগও বৃষ্টির চিহ্ন বা লহরী চিহ্নের মত স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে।

ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস উন্মোচনে জীবাশ্মের গুরুত্ব অপরিসীম ও এটা এক স্বতন্ত্র শাখাবিদ্যায় পরিণত হয়েছে। একে পুরাজীববিদ্যা বা জীবাশ্মবিদ্যা (Paleontology) বলে। কেম্ব্রিয়ান যুগের শিলায় প্রথম সুস্পষ্টভাবে জীবাশ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর আগেকার পাললিক শিলায় জীবাশ্ম খুবই অস্পষ্ট বা দেখতে পাওয়া যায় না। শিলায় জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় যুগে বিভিন্ন জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। ভূ-পৃষ্ঠে স্তরগুলোর অনুক্রম এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবাশ্মগুলো লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায় যে, কিভাবে জীবজগতের পরিবর্তন হয়েছে। মনে করা যাক, কোনও একটা অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে রক্ষিত জীবাশ্মগুলো বিবর্তনের ক্রম জানা গেল। ঐ অঞ্চলে নবীনতম স্তরের সঙ্গে জড়িত জীবাশ্ম হয়ত অন্য একটি অঞ্চলে সঞ্চিত শিলার প্রাচীনতম স্তরে পাওয়া গেল। এরপর পর্যায়ক্রমে ঐ সঞ্চয়ের নবীনতম শিলাস্তরগুলোতে জীবাশ্মের পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এইভাবে জীব সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় যুগে কিরূপ জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এখানে কোনও শিলাস্তরে জীবাশ্মের প্রকৃতি দেখে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ঐ শিলার ভূতত্ত্বীয় বয়স আপেক্ষিকভাবে নির্ণয় সহজসাধ্য হয়।

6.5 পাললিক শিলার শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তির তারতম্য অনুসারে পাললিক শিলাকে দুটো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা সংঘাত (Classic) ও অসংঘাত (Non-clastic) পাললিক শিলা। স্থলসঞ্জাত পলিগঠিত শিলাকে সংঘাত পাললিক শিলা ও স্থলসঞ্জাত পলি গঠিত নয় এমন পাললিক শিলাকে অসংঘাত পাললিক শিলা বলে।

6.5.1 সংঘাত পাললিক শিলা

উৎপত্তি ও প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে সংঘাত শিলাকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা (i) জলে সঞ্চিত পাললিক শিলা ও (ii) স্থলে সঞ্চিত পাললিক শিলা। জলে সঞ্চিত পাললিক শিলাই সংঘাত পাললিক শিলার অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে। জল থেকে পলির অবক্ষেপণ হলে পলি দানা ক্রমিক বাছাই হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয়। অপরপক্ষে জল ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম থেকে পলির সঞ্চয় হলে এরকম দানাক্রমিক বাছাই সম্ভব হয় না বা অসম্পূর্ণ থাকে। ছোট বড় পাথরের টুকরো বা গুঁড়ো একসঙ্গে মিশে থাকে।*

* **টীকা ঃ** *ওয়েন্টওয়ার্থের (Wentworth) দানাক্রমিক স্কেল অনুযায়ী দানার গড় ব্যাস 24/2 মি.মি.-এর বেশি হলে তাকে গ্র্যাভেল বলে। কঙ্কর (2-4 মি.মি.), নুড়ি (4-64 মি.মি.), কব্‌ল (64-145 মি.মি.), গণ্ডশিলা (256 মি.মি.-এর বেশি) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দানার ব্যাস 1/16 মি.মি. থেকে 2 মি.মি. পর্যন্ত হলে তাকে বালি, 1/256 থেকে 1/16 মি.মি. হলে সিল্ট এবং 1/256 মি.মি.-এর কম হলে তাকে কর্দম বলে।*

6.5.1.1 জলে সঞ্চিত পাললিক শিলা

উৎপত্তি ও পলির দানার আকারের উপর নির্ভর করে জলে সঞ্চিত সংঘাত পাললিক শিলাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) **স্থূলখণ্ডময় পাললিক শিলা (Rudaceous Sedimentary rocks) ঃ** নদী বা সমুদ্রতরঙ্গ বাহিত পলির স্থূলতর দানাগুলো অর্থাৎ গণ্ডশিলা, নুড়ি ও স্থূল বালি প্রধানত তীরের দিকে সঞ্চিত হয়। এরকম গ্র্যাভেল সমৃদ্ধ শিলাকে কংগ্লোমারেট বলে। যদি নদী বা সমুদ্রতরঙ্গ বা বায়ুর সাহায্যে শিলাখণ্ডগুলো বেশি দূরে রূপান্তরিত না হয় তাহলে গ্র্যাভেলগুলো উৎকৌণিক বা মসৃণ হবার সুযোগ পায় না। এরকম শিলাখণ্ড গঠিত শিলাকে ব্রেকসিয়া (breccia) বলে।

(2) **বালুকাময় পাললিক শিলা (Arenaceous Sedimentary rocks) ঃ** এই ধরনের শিলাকে সাধারণভাবে বেলে পাথর বলে। সাধারণত মহীসোপানের গভীরতম অংশে ও মহীঢালে গ্রাভেল খুব কমই পরিবাহিত হয় ও এই অঞ্চলের প্রাথমিক অংশে অপেক্ষাকৃত স্থূলদানা বালি ও পরবর্তী অংশে বালির সঙ্গে কিছু পরিমাণ সিল্ট ও কর্দমের সঞ্চয় হয়। কাজেই এই ধরনের শিলায় বালি ছাড়াও কিছু পরিমাণে সিল্ট ও কর্দম বর্তমান থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এখানে বালিকে দানার আকার দিয়েই বোঝান হচ্ছে ও এই বালির প্রধানত কোয়ার্টজ, ফেলস্পার ও লিথিক দানা নিয়ে গঠিত। লিথিক বালি বলতে অন্যান্য বিভিন্ন খনিজের ক্ষুদ্রাকার দানা বোঝায়। যদি বেলে পাথরের সিল্ট ও কর্দম একত্রে 15% এর কম হয় তাহলে তাকে অ্যারেনাইট বলে এবং এরা সম্মিলিতভাবে 15% বা তার বেশি হলে তাকে গ্রেওয়াকি বলে। অ্যারেনাইট ও গ্রেওয়াকিরও নানাপ্রকার ভেদ দেখা যায়। যেমন, বেলে পাথরে 90%-এর বেশি কোয়ার্টজ থাকলে তাকে কোয়ার্টজ অ্যারেনাইট বলে। ফেলস্পার সমৃদ্ধ (25%-এর বেশি) বেলে পাথরকে আরকেজ বলে। আককেজের কঙ্করীয় দানাগুলো বড় মাপের, কৌণিক বা অকৌণিক এবং অল্প থেকে মাঝারি রকম বাছাই হয়ে থাকে। এদের রঙ ফিকে গোলাপী বা ফিকে ধূসর হয়। ফেলস্পার সহজেই আবহিক বিকার প্রাপ্ত হতে পারে। কাজেই এর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, জলের সঙ্গে অল্প পথ পরিবহনের পরেই এটা সঞ্চিত হয়েছে, যার ফলে ফেলস্পার বিয়োজিত হবার সুযোগ পায়নি।

(3) **কর্দমময় পাললিক শিলা** (Argillaceous Sedimentary rocks) ঃ মহীসোপান ও মহীঢালের গভীরতম অংশে প্রধানত সিল্ট ও কর্দমের সঞ্চয় হয়। স্বভাবতই এই ধরনের শিলা সূক্ষ্মদানা বিশিষ্ট হয়। মহাদেশের পাললিক শিলার প্রায় অর্ধাংশই এই ধরনের শিলা দিয়ে গঠিত। এখানে শিলা সূক্ষ্মদানা বিশিষ্ট হয় মহাদেশের পাললিক শিলার প্রায় অর্ধাংশই এই ধরনের শিলা দিয়ে গঠিত। এখানে বলা দরকার, রাসায়নিক সংযুতির প্রকৃতি হিসাবে নয়, পলির দানার আকার দিয়ে কর্দমকে বোঝান হয়েছে। রাসায়নিক যৌগের এক বিশেষ শ্রেণী হিসেবে কথিত কর্দম খনিজের আকার কর্দম কণার থেকে বড়ও হতে পারে, তবে প্রায়শই কর্দম খনিজ কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম আকারের হয়ে থাকে। কর্দমময় পাললিক শিলারও নানা প্রকারভেদ দেখা যায়। সাধারণত শেল (shale) বলতে ফিসাইল (fissile) বা রেখা বিদারণ গঠনযুক্ত ক্লে-স্টোন বা সিল্ট স্টোনকে বোঝায়। কোনও পাথরের পাতলা পাতের আকারে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতাকে রেখা বিদারণ বলে। শেল পাথর রেখা বিদারণ বরাবর ফেটে গিয়ে পাতলা পাতের সৃষ্টি করে। ক্লে বা সিল্ট স্টোন এরকম পাতের আকারে না ভেঙে খণ্ড আকারে ভাঙলে তাকে মাড-স্টোন বলে।

সমুদ্র, হ্রদ বা জলাভূমির যে পরিবেশে কর্দম ও সিল্ট অবক্ষেপিত হয়, সেই পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রবাল জাতীয় কীটেরও উদ্ভব হয়। ফলে অনেক সময় শেলের সঙ্গে চুন ও কার্বন জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ দেখা যায়। যে শেলে যথেষ্ট পরিমাণ চুন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাকে চুনময় শেল ও কার্বন থাকলে তাকে অঙ্গারময় শেল বলে। মার্ল (Marl) হল চুন ও কর্দম মিশ্রিত এমন এক শিলা যা সহজে ভেঙে যায়। এটা আরও ভালভাবে সংঘবদ্ধ থাকলে একে মার্লস্টোন বলে। এদের মধ্যে 35%-65% চুন থাকে।

6.5.1.2 স্থলে সঞ্চিত সংঘাত শিলা

অনেক সময় স্থলের ওপরেই পলি সঞ্চিত হয়। বায়ু পরিবাহিত ও সঞ্চিত সূক্ষ্ম বালুকণা গঠিত হলুদ রঙের অল্প সংবদ্ধ, অস্তরীভূত বা অল্প স্তরীভূত শিলাকে লোয়েশ (Loess) বলে। উত্তর চীনে লোয়েশ মালভূমিতে এরকম বিস্তৃত লোয়েশ সঞ্চয় দেখা যায়। বেন্টোনাইট (Bentonite) হল আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত ভস্ম দিয়ে গঠিত শিলা। এরা অবশ্য সামুদ্রিক পরিবেশেও সৃষ্টি হতে পারে। হিমবাহ সঞ্চিত কৌণিক অবাছাই দানাবিশিষ্ট পদার্থ থেকে গঠিত শিলাকে টিলাইট (Tillite) বলে।

6.5.2 অসংঘাত পাললিক শিলা

অসংঘাত পাললিক শিলাকে দুটো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—(a) জীব থেকে উৎপন্ন ও (b) রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন।

6.5.2.1 জীব থেকে উৎপন্ন অসংঘাত শিলা

একে চারটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

(i) **চুনময় (Calcareous) ঃ** সমুদ্রের যে অংশে সংঘাত পলি পৌঁছয় না বা অল্প পৌঁছয়, সেখানে প্রবাল, ঝিনুক, শামুক, শাঁখ প্রভৃতি নানা ছোট-বড় সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। এদের কঙ্কাল ও দেহাবরণ চুন ($CaCO_3$) দিয়ে গঠিত। এদের মৃত্যু হলে এই সমস্ত অদ্রাব্য চুন জাতীয় পদার্থ সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত হয়। এটাই শিলীভূত হয়ে চুনাপাথরের সৃষ্টি করে। এরকম চুন অধঃক্ষেপে জীবের দেহের ভগ্নাংশ বর্তমান থাকতে পারে। তার থেকে ফসিলযুক্ত চুনাপাথর সৃষ্টি হয়। অনেক সময় চুন ছাড়া অন্য কণাকে (যেমন, বালি) কেন্দ্র করে চক্রাকারে চুনের সঞ্চয় ঘটে এবং গোল বা ডিম্বাকৃতি পদার্থের সৃষ্টি হয়। এরকম পদার্থ গঠিত চুনাপাথরকে উওলিটিক চুনাপাথর বা উওলাইট (Oolite) বলে।

খনিজ ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটকে $\{CaMg(Co_3)_2\}$ ডলোমাইট (Dolomite) বলে। কার্বনেট পাথরের অর্ধেকের বেশি ডলোমাইট খনিজ দিয়ে তৈরি হলে সেই পাথরকে ডলোমাইট বা ডলোস্টোন বলে। সরাসরি রাসায়নিক অধঃক্ষেপণের ফলে ডলোমাইট সৃষ্টি হতে পারে। তবে অধিকাংশ ডলোমাইটে ম্যাগনেসিয়াম আয়ন ক্যালসিয়াম আয়নকে প্রতিস্থাপিত করে কেলাস গঠনে অন্তর্গত হয়। নিম্ন সঞ্চরমান জলের সঙ্গে পরিবাহিত Mg আয়ন এই প্রতিস্থাপনে সাহায্য করে। সম্ভবত চুনাপাথর

গভীর স্থানে নিমজ্জিত হলে সঞ্চরমান উষ্ণ জলের Mg আয়নে Ca আয়নকে প্রতিস্থাপত করে ডলোমাইটের সৃষ্টি করে। তবে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

(ii) **অঙ্গারময় (Carbonaceous) ঃ** বিভিন্ন প্রকার কয়লা ও পিট এই ধরনের শিলার অন্তর্গত। সামুদ্রিক সংঘাত শিলার সঙ্গে এগুলো অন্তঃস্তর গঠন করে। মিঠে জলের জলাভূমিতে যে ঘন ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে তার থেকে কয়লা (Coal) বা শীট (Peat) সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত উদ্ভিদের পরিত্যক্ত অংশ জলের তলায় জমা হয় বলে অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিজ্জ পদার্থ আংশিকভাবে জরিত হয় ও বিয়োজনও কম হয়। ফলে জৈব পদার্থের সঞ্চয় বাড়তে পারে। অনেক সময় ঐ জৈব পদার্থ পরিবাহিত ও স্থানান্তরিত হয়ে অন্যত্রও জমা হতে পারে। পরবর্তীকালে ভূমির ক্রমনিমজ্জনের সময় এদের ওপর সংঘাত পলির সঞ্চয় ঘটে। ওপরের পলির চাপে ও উচ্চতর তাপাঙ্কে ঐ জৈব পদার্থ পিট বা কয়লার পরিবর্তিত হয়। কয়লা উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ভিজ্জ পদার্থ অল্প পরিবর্তিত হয়ে যে শিলা তৈদরি করে তাকে পিট বলে। উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি, পরিবর্তনের সময়কাল, ভূ-আন্দোলনের প্রকৃতি ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস ও লিগনাইট জাতীয় কয়লার সৃষ্টি হয়।

(iii) **বালুকাময় (Siliceous) শিলা ঃ** সমুদ্রে ডায়াটম, ইউফিউসোরিয়া, প্রভৃতি এককোষী উদ্ভিদ বালুকা জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। এর থেকে ডায়াটোমেসাল্ কর্দম, ইনফিউসোরিয়াল কর্দম নামে বালুকাময় শিলার সৃষ্টি হয়। অবশ্য এরকম পাথর খুবই বিরল।

(iv) **ফসফোরাইট (Phosphorite) ঃ** সামুদ্রিক মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙ্কাল বা হাড় ক্যালসিয়াম ফসফেট দিয়ে তৈরি হয়। এই সমস্ত অদ্রাব্য দেহাবশেষ সঞ্চিত পদার্থ উৎক্রান্ত রূপান্তরিত (incipient metamorphism) হয়ে ফসফোরাইট শিলার সৃষ্টি হয়। সামুদ্রিক পাখির বিষ্ঠার সঞ্চয় (গুয়ানো-Guano) থেকেও ফসফোরাইট শিলার সৃষ্টি হতে পারে। ভারতবর্ষের রাজস্থানে ও তামিলনাড়ুতে পাললিক ফসফেট পাথরের সঞ্চয় হয়েছে।

6.5.2.2 রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন অসংঘাত শিলা

বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্র বা হ্রদের জলের লবণের দ্রাব্যতা সম্পৃক্ত সীমা অতিক্রম করলে জলের মধ্যকার লবণের অধঃক্ষেপণ হয়। এদেরকে সাধারণভাবে ইভাপোরাইট (Evaporite) বলে। এরকম প্রধান লবণগুলো হল হেলাইট (NaCl), জিপসাম ($CaSO_4,2H_2O$), অ্যানহাইড্রাইট ($CaSO_4$)। ইভাপোরাইট সাধারণত শেল অথবা ডলোমাইট পাথরের সঙ্গে স্তর গঠন করে। কচ্ছের রান অঞ্চলে, রাজস্থানের সম্বর হ্রদ ও মহারাষ্ট্রের লোহার হ্রদে ইভাপোরাইট পলি অবক্ষেপ দেখা যায়। জলাভূমি বা হ্রদ থেকে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে সোদক লৌহ অক্সাইডের অধঃক্ষেপণকে বগ আকরিক লোহা বলে (Bog iron ore)।

6.6 রূপান্তরিত শিলা

বর্ধিত চাপ, তাপ ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়ায় আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পরিবর্তনকে শিলার রূপান্তর বলে। রূপান্তরের সময় শিলা কঠিন অবস্থাতেই থাকে। সেইজন্য রূপান্তরের পরও আদি শিলার

প্রাথমিক গঠনগুলোর স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে চিহ্ন থেকে যায়। রূপান্তরিত শিলার প্রধান ও গঠনগুলো আংশিকভাবে আদি পাথরের বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং আংশিকভাবে রূপান্তরের নিজস্ব অবস্থার ওপর নির্ভর করে। উচ্চ তাপাঙ্কে শিলার আংশিক গলনের ফলে যে সব পরিবর্তন হয় সেগুলো রূপান্তরের মধ্যে পড়ে না। আবার ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে বা কাছে আবহিক বিকার,পলির সিমেন্ট প্রাপ্তি বা অনুরূপ কতকগুলো পরিবর্তনও রূপান্তরের মধ্যে ধরা হয়নি। কেবলমাত্র বর্ধিত চাপ ও তাপের প্রভাবে যে রূপান্তর হয় তাতে সামগ্রিকভাবে শিলার রাসায়নিক সংযুতির পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ নতুন পদার্থের সংযোজন ঘটেনা, কিন্তু ম্যাগমার অনুপ্রবেশ ঘটলে উচ্চ তাপাঙ্ক ছাড়াও ম্যাগমার মধ্যস্থিত নানা উদ্বায়ী গ্যাস শিলার মধ্যে প্রবেশ করে ও শিলা খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রূপান্তরিত শিলার রাসায়নিক সংযুতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে পারে।

6.6.1 রূপান্তর প্রক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

রূপান্তরের প্রধান নিয়ন্ত্রকগুলোর ওপর ভিত্তি করে রূপন্তর প্রক্রিয়াকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা (1) তাপীয় রূপান্তর (Thermal metamorphism); (2) বিচূর্ণন রূপান্তর (Cataclastic metamorphism) ও (3) আঞ্চলিক রূপান্তর (Regional metamorphism)।

6.6.1.1 তাপীয় রূপান্তর

প্রধানত উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে শিলার পরিবর্তনকে তাপীয় রূপান্তর বলে। এই উচ্চ তাপমাত্রার আমদানি দু'ভাবে হতে পারে—(i) উদ্বেধী আগ্নেয় বস্তুর সংস্পর্শের ফলে রূপান্তর ও (ii) ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ভূ-ত্বকের গভীরতর অংশে প্রবেশ ও উচ্চ ভূ-তাপমাত্রার প্রভাবে রূপান্তর। প্রথমোক্ত রূপান্তরকে সংস্পর্শে রূপান্তর ও দ্বিতীয়োক্ত প্রকারকে ভূ-তাপীয় রূপান্তর বলে।

(i) **সংস্পর্শে রূপান্তর (Contact metamorphism) ঃ** ভূ-ত্বকে গলিত ও উত্তপ্ত ম্যাগমার অনুপ্রবেশ হলে উচ্চ তাপাঙ্ক ও শীতলীভবনের সময় ম্যাগমায় অবস্থিত গ্যাসের প্রভাবে শিলার রূপান্তর ঘটে থাকে। অনুপ্রবিষ্ট ম্যাগমার চারপাশের শিলার রূপান্তর সুস্পষ্ট হয়, কিন্তু ম্যাগমা থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায়, রূপান্তরের মাত্রা ততই কমতে থাকে ও শেষে যথেষ্ট দূরে আদি শিলা অরূপায়িত থাকে। যে শিলার মধ্যে ম্যাগমার অনুপ্রবেশ ঘটে, তার প্রকৃতির ওপর রূপান্তরের প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। সংস্পর্শ মণ্ডলে বিশুদ্ধ বেলেপাথর কোয়ার্টজাইটে পরিবর্তিত হয়। শেল পাথর রূপান্তরিত হয়ে সূক্ষ্মদানা বিশিষ্ট ভীষণ কঠিন পাথরে পরিণত হয়। এদের দেখতে সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট আগ্নেয় শিলা বা কাল ফ্লিন্টের মত হয়। একে হর্নফেল (Hornfels) বলে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে হর্নফেলে নতুন খনিজের সৃষ্টি হয়েছে। বিশুদ্ধ চুনাপাথর মার্বেলে পরিণত হয়। এতে ক্যালসাইট খনিজের নতুনভাবে কেলাসন হয় ও ক্ষুদ্র হলেও কোলাসগুলি খালি চোখে দেখা যায়। যে সমস্ত চুনাপাথরে অপবস্তু (impurities) হিসেবে সিলিকা থাকে, সেখানে 500° সে-এর ওপর তাপমাত্রায় চুন ($CaCO_3$) থেকে CO_2 বিতাড়িত হয় ও CaO সিলিকার সঙ্গে ক্রিয়া করে উওলাস্টোনাইট (Wollastonite) নামে এক নতুন খনিজ (ক্যালসিয়াম সিলিকেট) তৈরি করে। যদি চুনাপাথরে তাপবস্তু হিসেবে ডলোমাইট খনিজ বর্তমান থাকে, তাহলে পাইরক্সিন খনিজ সৃষ্টি হয়। অবশ্য বহিঃপ্রান্তদেশে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ

পরিবেশে পাইরক্সিনের বদলে টেমোলাইট (Tremolite) খনিজ উৎপন্ন হয়। ট্রেমোলাইট ও পাইরক্সিনের রাসায়নিক সংযুতি একই রকমের, তবে ট্রেমোলাইট খনিজগুলো ছুঁচের মত আকৃতি বিশিষ্ট হয়। চুনাপাথরে অপবস্তু হিসেবে কর্দম খনিজ থাকলে গার্নেট (Garnet) ও অন্যান্য নতুন খনিজের সৃষ্টি হয়।

গ্রানিট পাথরে রায়োলাইট (গ্রানিটের গলিত রূপ) ম্যাগমার অনুপ্রবেশ হলে গ্রানিট অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ব্যাসল্ট বা অন্য নিঃসারী আগ্নেয় শিলার মধ্যে পাতালিক শিলার অনুপ্রবেশ হলে শিলার আমূল পরিবর্তন হয় (রূপান্তরিত শিলার রূপভেদ দ্রষ্টব্য)।

(ii) ভূ-তাপীয় রূপান্তর (Geothermal metamorphism) : কিছু কিছু রূপান্তরিত শিলার ক্ষেত্রে মনে হয় যে, একসময়ে এরা ভূ-ত্বকের গভীর অংশে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং বর্ধিত ভূ-তাপ ও উপরিস্থিত পলির চাপের মধ্যে শিলার রূপান্তর হয়েছে। এরকম অবস্থায় শিলায় নতুন খনিজের উদ্ভব হতে পারে। উচ্চচাপের মধ্যে এই রূপান্তর হয় বলে সাধারণত গার্নেটের মত স্থান সঙ্কুলানকারী (space conserving) খনিজের সৃষ্টি হয়। যেহেতু মূলত পৃথিবীর নিজস্ব তাপ এরূপ রূপান্তরের প্রধান কারণ, সেইহেতু এরকম রূপান্তরকে ভূ-তাপীয় রূপান্তর বলে।

6.6.1.2 বিচূর্ণন রূপান্তর (Cataclastic metamorphism)

নিচু চাপযুক্ত অঞ্চলে ও নিম্ন তাপাঙ্কে থ্রাস্ট স্তূপ অধিরোপিত হবার সময় বা চ্যুতি সমন্বিত এলাকায় চ্যুতির দু-পাশের শিলা চলাচলের সময়ে কৃন্তন পীড়নের উদ্ভব হয়। ফলে খনিজ কেলাসগুলো পিষ্ট, দ্রাঘিত, খণ্ডিত বা চূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু নতুন খনিজ সৃষ্টি খুব কম হয় বা হয় না। অনেকক্ষেত্রে পীড়নের তীব্রতা বেশি হলে তাপাঙ্কও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে ও সেক্ষেত্রে কিছু নতুন খনিজের সৃষ্টি হয়। এই রূপান্তরকে বিচূর্ণন রূপান্তর বা ক্যাটাক্লাস্টিক রূপান্তর বলে ও এই রকম গ্রথনযুক্ত শিলাকে মাইলোনাইট (Mylonite) বলে। কোনও কোনও থ্রাস্ট স্তূপের তলায় মাইলোনাইট এতই বিকৃত হয়ে যায় যে শিলার আদিরূপ চিনতেই পারা যায় না। তবে অনেক সময় গুঁড়ো পাথরের গুঁড়ো না হওয়া আদি পাথরের ছোট টুকরো থাকে। এই টুকরোগুলো চ্যুতির চলনের দিকে দ্রাঘিত বা লম্বিত হয়। এখানে বলা দরকার যে, মাইলোনাইট শিলা গুড়ো দিয়ে তৈরি হলেও এদের সংবদ্ধতা নষ্ট হয় না।

আদি শিলার খনিজ সংগঠনের ওপরও মাইলোনাইটের আকৃতি নির্ভর করে। যেমন গ্রানাইটে প্রচুর বায়োটাইট থাকে বলে চাপের প্রভাবে এগুলো ভেঙে সমান্তরাল দিকে বিস্তৃত অসংখ্য পাতলা পাতলা পাতার সৃষ্টি করে ও উৎপন্ন মাইলোনাইটকে অনেকটা কাল স্লেট পাথর বা ফিলাইটের মত দেখতে হয়। একে ফিলাইট-মাইলোনাইট বা সংক্ষেপে ফাইলোনাইট (Phyllonite) বলে।

মাইলোনাইট যান্ত্রিকভাবে উৎপন্ন রূপান্তরিত শিলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত মাইলোনাইট ও সম্পূর্ণাংশ নতুন খনিজ গঠিত রূপান্তরিত শিলার মাঝামাঝি রূপও দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভূ-ত্বকের গভীর অঞ্চলে বিচূর্ণন রূপান্তর ক্রমবর্ধমান ভূ-তাপমাত্রার জন্য আঞ্চলিক বা গতীয়-তাপীয় রূপান্তরে পরিণত হয়।

6.6.1.3 আঞ্চলিক রূপান্তর বা গতীয়-তাপীয় রূপান্তর (Regional or dynamothermal metamorphism)

বলিত অঞ্চলে, বিশেষ করে প্রাক্-কেম্ব্রিয়ান যুগের শিলা গঠিত অঞ্চলে, বহুশত বর্গ কি.মি. অঞ্চল জুড়ে রূপান্তরিত শিলা দেখা যায়। এই রূপান্তরের জন্য স্থানীয় কোনও কারণ (যেমন আগ্নেয় অবয়বের সংস্পর্শ ইত্যাদি) দেখা যায় না। এইপ্রকার রূপান্তরকে আঞ্চলিক রূপান্তর বলে। সাধারণত গতিশীল জিওসিনক্লাইন অঞ্চলে এই ধরনের রূপান্তর হয়ে থাকে। এরূপ অংশে সুগভীর পলি ভূগর্ভে স্থানান্তরিত হয় ও উচ্চ তাপাঙ্ক ও অবরোধী চাপের সম্মুখীন হয়। এছাড়া ভূ-সংক্ষোভজনিত ভাঁজপ্রাপ্তি কালে সম্মিলিত স্তরগুলোর মধ্যে বিসর্পণ (slipping) ও ঘর্ষণজনিত পশ্চাদাকর্ষণ (frictional drag) ঘটে। বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ঘর্ষণজনিত পশ্চাদাকর্ষণ শিলার মধ্যে অন্তঃ ও আন্তঃখনিজের মধ্যে চলনের সৃষ্টি করে এবং শিলা রূপান্তরে সাহায্য করে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বলার অর্থ এই যে, অনেক সময় দেখা যায় যে শিলাস্তর ভীষণভাবে বলিত বা ভাঁজপ্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও রূপান্তরিত হয়নি। আঞ্চলিক রূপান্তরে শিলার পুরোনো গ্রথন পরিবর্তিত হয়ে নতুন গ্রথনের সৃষ্টি হয়। বর্ধিত চাপ ও তাপের মধ্যে ভঙ্গুর খনিজগুলো অবঘর্ষিত ও ত্বচিত (laminated) হয়। অপরপক্ষে অনুরূপ অবস্থায় প্লাস্টিক খনিজগুলো সাধারণত কোনও এক সম্ভেদতল বরাবর দুটো স্বতন্ত্র অংশে ভাগ হয়ে যায়। এই বিভেদ তলের লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে এক অর্ধ (180°) আবর্তিত হয় ও দুই অর্ধ ঐ বিভেদতল বা অন্য কোন তল (সংযুতি তল compositional plane) বরাবর মিলে যায়। এই প্রক্রিয়াকে ঘূর্ণন যুগ্ম (rotation twin) বলে। গতীয় বা আঞ্চলিক রূপান্তরকালে ক্ষুদ্র স্কেলে এরকম বহুসংখ্যক সমান্তরাল সম্ভেদ তলে ঘূর্ণন যুগ্মের সৃষ্টি হতে পারে। একে বহু সংশ্লেষিত যুগ্ম (polysynthetic twin) বলে। প্লাস্টিক খনিজের ক্ষেত্রে এধরনের রূপান্তর দেখা যায় ও সিস্ট গঠনে সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেলাস কাঠামো নতুনভাবে সজ্জিত হয় ও খনিজগুলোর আলোকঅক্ষের দিক বিন্যাসের (orientation) পরিবর্তন ঘটে। এই দিক বিন্যাস অনুধাবন করে শিলার ওপর কোন দিক থেকে বল প্রযুক্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে ধারণা জন্মে যা ভূ-সংক্ষোভ সম্পর্কিত নানা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

কেলাস অক্ষ (crystal axis) : কেলাস অক্ষ হল কতকগুলো কাল্পনিক রেখা যা কেলাসের ভেতর এক বিন্দুতে মিলিত হয়। কোনও খনিজের কেলাসে যেসব কিনারা থাকে সেই সমস্ত কিনারাগুলোর সমান্তরাল ও কেলাসের কেন্দ্রবিন্দুগামী কাল্পনিক সরলরেখাগুলো বা কেলাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাকে কেলাস অক্ষ বলে। যেমন ঘনকে তিনটি পরস্পর লম্ব সমান অক্ষ থাকে। টুর্মালিন কেলাস দুটি পার্শ্ব ও ওপর-নীচ দিয়ে মোট আটটি তল নিয়ে গঠিত। এরকম কেলাস তিনটি সমান অনুভূমিক অক্ষ ও উল্লম্ব দিকে একটা দীর্ঘতর অক্ষ রয়েছে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলোর এক বিশেষ বাহ্যিক প্রকাশ হল পত্রায়ন গঠন (foliated structure) বা সিস্ট গঠন। এরকম শিলার কতকগুলো ঘেঁষাঘেঁষি প্রায় সমান্তরাল তল বরাবর সরু পাত বা পাতার আকারে ভাঙবার প্রবণতা থাকে। একে পত্রায়ন গঠন বলে। প্রধানত পাতজাতীয় খনিজ কেলাসের

সমান্তরাল সজ্জার ফলেই পত্রায়ন গঠনের সৃষ্টি হয়। অভ্র (মাসকোভাইট ও বায়োলাইট) এব ক্লোরাইট সাধারণত এই ধরনের খনিজের সংস্থান করে। এই সমস্ত খনিজ কেলাস স্বভাবতই পাতজাতীয় এবং পাতের পৃষ্ঠদেশের সমান্তরাল নিখুঁত সম্ভেদ থাকে। এই জন্য যে সমস্ত শিলায় এই ধরনের বহু সম্ভেদযুক্ত পাতজাতীয় খনিজ রয়েছে, সেগুলো সম্ভবত সংশ্লেষিত যুগ্ম প্রক্রিয়ায় ভেঙে সমান্তরাল দিকস্থিতি সমন্বিত তল বরাবর অবস্থান করে ও পত্রায়ন গঠন তৈরি করে। (চিত্র : 6.13)।

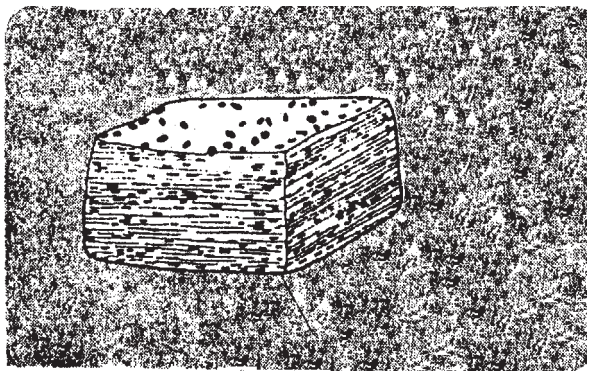

চিত্র 6.13 : *পাত জাতীয় খনিজ / মণিক দানার পত্রায়ন (foliation)।*

যে শিলায় পত্রায়ন অস্পষ্ট থাকে তাকে নাইস (gneiss) বলে। যে শিলায় পত্রায়ন সুস্পষ্ট ও খুব ঘেঁষাঘেঁষি, তাকে সিস্ট (schist) বলে। ফিলাইট পাথরে পত্রখনিজগুলো সিস্টের মত বড় হয় না ও খালি চোখে বোঝা যায়না, কিন্তু এদের উপস্থিতিতে ফিলাইটের উপরিভাগ চক্‌চক্‌ করে। শ্লেট পাথরে পত্রখনিজগুলো ফিলাইট থেকেও সূক্ষ্ম থাকে কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রখনিজগুলো বিভিন্ন সমান্তরাল নিখুঁত তল বরাবর ঘেঁষাঘেঁষি সজ্জিত থাকে। শ্লেটের এরকম গঠনকে বিদার্যতা (fissility) বলে।

অনেক সময় অ্যাম্ফিবোল, পাইরক্সিন প্রভৃতির সূচের মত বা লাঠির মত লম্বা ধরনের খনিজগুলোর দানা সমান্তরাল বিন্যস্ত হয়ে রেখা সিস্ট গঠন করে। গভীর ভূ-অভ্যন্তরে অনেক ক্ষেত্রে শিলা আংশিক ভাবে গলিত হতে পারে এবং ঐ পদার্থ বা অন্য উৎস থেকে আসা ঐ ধরনের পদার্থ শিলার দুই পত্রায়ন তলের মধ্যবর্তী ফাঁকে অনুপ্রবেশ করতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক সময় অনুপ্রবিষ্ট তরল-বায়ব পদার্থ আশ্রয়দাতা শিলার কোনও খনিজ দ্রবণের মধ্যে নিয়ে আসে, আর ঠিক সেই জায়গায় দ্রবণ থেকে এক বিশেষ খনিজ দ্রবণে আসা খনিজটিকে প্রতিস্থাপিত করে। এই ঘটনাকে অভিঘটন (Metasomatism) বলে। এইভাবে ইঞ্জেকশান নাইস ও মিগমাটাইট তৈরি হয়। আরও বেশি পদার্থ প্রবেশ করলে ব্যান্ডেড বা পটিদার নাইস সৃষ্টি হয়। মিগমাটাইটের (মিশ্রিত পাথর) ভেতর দুটো পৃথক অংশের সৃষ্টি হয়। এতে উচ্চ মাত্রায় রূপান্তরিত অংশের অবশেষ ও অনুপ্রবেশকারী আগ্নেয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

ভঙ্গিল পর্বতের অষ্ঠি (core) অঞ্চলে বহিরাগত আগ্নেয় তরল-বায়ব পদার্থ বা স্থানীয় শিলার আংশিক গলন সঞ্জাত তরল পদার্থের অনুপ্রবেশ বা শুষ্ক অবস্থায় পাথরের কেলাস দানার ভেতর দিয়ে ও দানাগুলোর মধ্যবর্তী সীমানা ধরে আয়নিক ব্যাপনের (ionic diffusion) ফলে স্থানীয় শিলায় K, Na, Al আয়নের বেশি সংখ্যায় প্রবেশ ও Ca, Fe প্রভৃতি আয়নের বেশি সংখ্যায় নির্গমনের ফলে

গ্রানাইট পাথর সৃষ্টি হয় বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রক্রিয়ায় গ্রানাইট সৃষ্টিকে গ্রানাটীকরণ (Granitisation) বলে। এইভাবে সৃষ্ট গ্রানাইটে নরমভাব আসে ও এই অবস্থায় এটা উদ্বেধী হিসাবে সচল হতে পারে। ভঙ্গিল পর্বতের অষ্ঠি অংশে গ্রানাইটের সঙ্গে মিগমাটাইটের উপস্থিতি প্রক্রিয়ার সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করে। তবে এ বিষয়ে এখনও ঐক্যমত গড়ে ওঠেনি।

মনে রাখা দরকার, উপরোক্ত অভিঘটন প্রক্রিয়ায় শিলা রূপান্তরে তাপাঙ্ক সাধারণ রূপান্তর থেকে অনেক বেশি থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় শিলার আংশিক গলন হয়, যা রূপান্তর প্রক্রিয়া বর্হিভূত বলে ধরা হয়। এইজন্য এইসব প্রক্রিয়াকে অতি রূপান্তর (Ultrametamorphism) বলা হয়।

6.6.2 রূপান্তরিত শিলার রূপভেদ (Facies of mctamorphic rocks)

রূপান্তরিত শিলায় গঠিত নতুন খনিজগুলোকে প্রাকৃতিক থার্মোমিটার বা ব্যারোমিটার মনে করা যেতে পারে। কোনো একপ্রকার শিলায় এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে এক বিশেষ ধরনের খনিজ সমাবেশের সৃষ্টি হয়। ঐ খনিজগুলোর উপস্থিতি থেকে আন্দাজ করা যায় ঐ রূপান্তরিত শিলা কি রকম তাপ ও চাপের পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছিল। এর থেকে শিলা রূপান্তরের মাত্রা ও রূপভেদ সম্পর্কে ধারণা জন্মে। এস্‌কোলা (1920) অভিমত প্রকাশ করেন, যেসব শিলা একই রকম ভৌত অবস্থার মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং যাদের খনিজগুলো সাম্য অবস্থায় গঠিত হয়েছে, তাদের একটা রূপভেদের মধ্যে অন্তর্গত করা যায়। এসকোলা দেখিয়েছেন যে, একই রাসায়নিক উপাদান বিশিষ্ট শিলা বিভিন্ন চাপ ও তাপাঙ্কে বিভিন্ন খনিজ সমাবেশ তৈরি করে। আবার রাসায়নিক উপাদান বিভিন্ন থাকলে অনুরূপ ভৌত পরিবেশে খনিজ সমাবেশের বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়।

গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে রূপান্তরিত শিলার খনিজগুলোকে ও খনিজ সমাবেশগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে তাদের স্থায়িত্ব কি রকম তাপাঙ্ক ও চাপের মধ্যে হতে পারে, সেই সম্বন্ধে বহু নির্দেশ পাওয়া গেছে। তার থেকে বিভিন্ন ভৌত পরিবেশে কি রকম রূপভেদ সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে এক মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। নীচে রূপান্তরিত শিলার বিভিন্ন রূপভেদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখা হল।

6.6.2.1 সবুজ সিস্ট রূপভেদ (Green schist facies)

মাঝারি তাপ, নিম্ন তাপমাত্রা ও জলের উপস্থিতিতে এই ধরনের রূপভেদ সৃষ্টি হয়। মায়োজিও-সিনক্লাইনে বিরূপিত শ্লেট, ফিলাইট, ক্লোরাইট ও মাইকা সিস্ট, মার্বেল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ব্যাথোলিথের অনুপ্রবেশের ফলেও এই ধরনের রূপভেদ সৃষ্টি হতে পারে। এই রূপভেদ নিম্ন থেকে মাঝারি মাত্রার রূপান্তর নির্দেশ করে।

6.6.2.2 নীল সিস্ট রূপভেদ (Blue schist facies)

উচ্চ তাপ ও চাপ এবং প্রচুর জলের উপস্থিতিতে এই ধরনের রূপভেদ সৃষ্টি হয়। রসাতলগামী ভূ-প্লেট মণ্ডলে (subduction zone) ইউজিওসিনক্লাইন পরিবেশে ও ভঙ্গিল পর্বতের অষ্ঠি অঞ্চলে তীব্র বিরূপণের জন্য এই ধরনের রূপভেদ সৃষ্টি হয়। এই রূপভেদ উচ্চমাত্রার রূপভেদকে নির্দেশ করে। এই সিস্ট সূক্ষ্ম থেকে মাঝারি দানা বিশিষ্ট হয়।

6.6.2.3 অ্যাম্ফিবোলাইট রূপভেদ (Amphibolite facies)

এই রূপভেদ নীল রূপভেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে। ইউজিওসিনক্লাইনে অগ্নুৎপাত-সৃষ্ট ওফিওলাইট (ক্ষারকীয় ও অতিক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলা) রূপান্তরিত হয়ে অ্যাম্ফিবোলাইট (অ্যাম্ফিবোল খনিজ সমৃদ্ধ) শিলায় পরিণত হয়। এর সঙ্গে মাইকা সিস্ট ও কোয়ার্টজাইট থাকে। এরূপ রূপভেদে সার্পেন্টাইন খনিজও সৃষ্টি হতে পারে। এটাও উচ্চমাত্রার রূপান্তরকে নির্দেশ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, নিম্ন থেকে মাঝারি চাপ ও উচ্চ তাপাঙ্কে এই ধরনের রূপভেদ তৈরি হয়।

6.6.2.4 গ্র্যানুলাইট (Granulite)

অতি উচ্চ চাপ ও তাপ এবং ঘাটতি জলের পরিবেশে গ্র্যানুলাইট রূপভেদের সৃষ্টি হয়। জিওসিনক্লাইনের গভীরতম অংশে সৃষ্ট নাইস, গ্র্যানুলাইট ও গ্রানাইট শিলা এই রকম রূপভেদকে উপস্থাপিত করে। কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার সমৃদ্ধ এবং এর সঙ্গে কিছু পাইরক্সিন ও গার্নেট মিশ্রিত মাঝারি আকারের দানাবিশিষ্ট সম-আকৃতির গ্রথনযুক্ত শিলাকে গ্র্যানুলাইট বলে। এই শিলায় কিছু কিছু ব্যান্ড বা খনিজ পটি দেখা যায়।

6.6.2.5 একলোগাইট রূপভেদ (Eclogite facies)

এটাই উচ্চতম মাত্রার রূপান্তর নির্দেশ করে। ক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলা থেকে এই ধরনের রূপভেদ সৃষ্টি হয়। খুব সীমিত অঞ্চলেই এই ধরনের রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। নীল সিস্ট যে পরিবেশে সৃষ্টি হয়, অনেকটা সেইরকম পরিবেশেই একলোগাইট সৃষ্টি হয়।

6.6.3 রূপান্তরিত শিলার শ্রেণীবিভাগ

শিলা যে চাপ ও তাপাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই চাপ ও তাপাঙ্ক অনুসারে রূপান্তরিত শিলার শ্রেণীবিভাগ করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু এরকম আদর্শ শ্রেণীবিভাগ এখনও সম্ভব হয়নি। রূপান্তরিত শিলাকে গ্রথন, উৎপত্তিস্থল, রূপভেদ, রূপান্তর প্রক্রিয়া, খনিজ সমাবেশ, রূপান্তর মাত্রা প্রভৃতি নানা ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। কিন্তু রূপান্তরিত শিলা উপরোক্ত গুণাবলী বিচ্ছিন্নভাবে অর্জন করে না। এদের উৎপত্তিতে এক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন আঞ্চলিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মায়োজিওসিনক্লাইনের

সঞ্চয় পরিবেশে কর্দমময় পাথর (যেমন শেল) মাঝারি চাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ কতকগুলো সাম্য খনিজের সৃষ্টি করে। এগুলোর প্রধান হল অ্যালবাইট (39.9%), ক্লোরাইট (29.4%), এপিডোট (23%) ও অন্যান্য (7%)। এই বিশিষ্ট ধরনের খনিজের খনিজ সমাবেশকে সবুজ সিস্ট বলে। মাঝারি তাপমাত্রা ও নিম্ন চাপে রূপান্তর স্বভাবতই নিম্ন মাত্রার হবে। ক্লোরাইট, মাইকা প্রভৃতি পত্রজাতীয় খনিজের উপস্থিতিতে এর পত্রায়ন গ্রথন হবে। সাধারণত ক্লোরাইট-এর রঙ সবুজ হয়। এই জন্য ক্লোরাইটের উপস্থিতি সবুজ সিস্ট গঠন করে। উৎপত্তি ও রূপান্তরের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে রূপান্তরিত শিলার শ্রেণীবিভাগ করা হল (সারণী 6.3)।

6.7 ভূমিরূপ গঠনে শিলার প্রভাব

ভূ-পৃষ্ঠে প্রায়শই শিলাপ্রকৃতির সঙ্গে ভূমিরূপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ভূমিরূপের ওপর শিলার প্রভাবকে আমরা দুটো স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করতে পারি, যথা শিলার গঠনের প্রভাব ও শিলাগুণের প্রভাব। সঙ্কীর্ণ অর্থে শিলার গঠন বলতে শিলারাশির বিন্যাস, যেমন বলি, সমনতি সম্পন্ন স্তর, চ্যুতি প্রভৃতিকে বোঝায়। কিন্তু কোনও একটা নির্দিষ্ট শিলাস্তরের বা স্থানীয় শিলার প্রবেশ্যতা, যান্ত্রিক কাঠিন্য, আবহিক বিকার ও ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা, দারণ, ফাটল, সম্ভেদ, পত্রায়ন তল প্রভৃতিকে শিলার গুণ বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠে স্থূল ভূমিরূপ সৃষ্টিতে শিলার গঠন মুখ্য ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এই স্থূল ভূমিরূপের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ অবয়ব সৃষ্টিতে শিলাগুণের প্রভাবই বেশি।

6.7.1 গঠনের প্রভাব

সমান্তরাল বলি গঠিত অঞ্চলে ভূমিরূপ পরিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় অনুমান করা যায় যে, সমান্তরাল শ্রেণী ও উপত্যকার সৃষ্টি হয়। ঊর্ধ্বভঙ্গের ওপর শ্রেণী ও অধোভঙ্গের উপর উপত্যকা শিলা গঠনের সঙ্গে সুসমঞ্জস ভূমিরূপ যা ভূ-সংক্ষোভের ফলে সরাসরি উৎপন্ন হয়। ভারতের শিবালিক পর্বত ও আল্পাসের জুরা পর্বতে এরকম গঠন ও ভূমিরূপের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ঊধর্বভঙ্গ ও অধোভঙ্গগুলো যদি পরস্পর সমান্তরাল না হয়ে প্রতিসারী বা অভিসারী হয়, তাহলে যেখানে বলির মিলন হয় সেখানে শৈলশিরা বা শৈলশ্রেণীর মিলন হয়, আর যেখানে ঊর্ধ্বভঙ্গগুলো মিলনের পর প্রতিসারী হয় সেখানে শ্রেণীগুলোও প্রতিসারী হয়।

যেখানে স্তরীভূত শিলার নতি একই দিকে রয়েছে ও স্তরগুলো পালাক্রমে শক্ত ও নরম শিলা দিয়ে গঠিত, সেখানে ভূমিরূপ বিবর্তনের পরিণত অবস্থায় ভৃগু উপত্যকা (scrap and vale) ভূ-প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। শিলার আয়াম বরাবর কোমল শিলার ওপর উপত্যকা ও কঠিন শিলার উপর ভৃগুর সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে গম্বুজ গঠন যুক্ত অঞ্চলে গম্বুজকে চক্রাকারে বেষ্টন করে কোমল শিলার ওপর উপত্যকা ও ঐ উপত্যকার নিম্ন ঢালের দিকে পাশে কঠিন শিলার ওপর ভৃগু বা খাড়াতলের সৃষ্টি হয়।

সরাসরি চ্যুতির ফলে হর্স্ট, গ্রাবেন বা তির্যক চ্যুত স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হতে পারে। আবার ক্ষয়ের ফলে উপরোক্ত বিভিন্ন ভূমিরূপের সমতলীকরণের পর ভূমির পুনরুত্থান ও চ্যুতি রেখার দুই পার্শ্বে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের ফলে চ্যুতি রেখা স্তূপ পর্বত, চ্যুতি রেখা গ্রস্ত উপত্যকা প্রভৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, শিলার গঠন বিভিন্নভাবে ভূ-পৃষ্ঠে স্থূল ভূমিরূপ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।

সারণী 6.3 : রূপান্তরিত শিলার শ্রেণীবিভাগ

উৎপত্তিস্থল	আদিশিলা	রূপান্তরের মাত্রা	রূপান্তর প্রক্রিয়া ও রূপভেদ	খনিজ সমাবেশ	রূপান্তরিত শিলা	গ্রথন
মহীসোপান ও মায়োজিও-সিনক্লাইন	চুনময়	মাঝারি থেকে উচ্চ	সংস্পর্শ ও আঞ্চলিক রূপান্তর	চুল, ডলোমাইট	মার্বল	অপত্রায়ন
	বালুকাময়	মাঝারি থেকে উচ্চ	সংস্পর্শ ও আঞ্চলিক রূপান্তর	প্রধানত কোয়ার্টজ	কোয়ার্টজাইট	অপত্রায়ন
	কোয়ার্টজ ফেলস্প্যাথিক	উচ্চ	আঞ্চলিক; গ্র্যানুলাইট	প্লাজিওক্লেজ (49.5%), হাইপারস্থিন (25.3%), ডাই-অক্সাইড (9.6%), অর্থোক্লেজ (7.1%), অন্যান্য (7.4%)	নাইস	পটিদার
মায়োজিওসিন-ক্লাইন বা ইউজিওসিনক্লাইন	কর্দমময়	অল্প	আঞ্চলিক; সবুজসিস্ট	আলবাইট (39.9%), ক্লোরাইট (29.4%) এপিডোট 23.0%, অন্যান্য (7.7%)	শ্লেট, ফিলাইট	পত্রায়ন
		মাঝারি	আঞ্চলিক; সবুজসিস্ট	ওপরের মত	মাইকা ও ক্লোরাইট সিস্ট	পত্রায়ন
		মাঝারি থেকে উচ্চ	আঞ্চলিক; নীলসিস্ট	গ্লকোফেন (নীল রঙের এক রকম অ্যাম্ফিবোল), জেডাইট, অ্যারাগোনাইট	সিলিমেনাইট সিস্ট	পত্রায়ন
ইউজিওসিনক্লাইন	ব্যাসল্ট	মাঝারি থেকে উচ্চ	আঞ্চলিক; অ্যাম্ফিবোলাইট	অ্যানরথাইট (26.5%), হর্ণব্লেন্ড (71.5%), কোয়ার্টজ (2.0%)	অ্যাম্ফিবোলাইট	পত্রায়ন
		অতি উচ্চ	আঞ্চলিক; একলোগাইট	ওমফাসাইট (48.5%), গার্নেট (50.5%), অন্যান্য (1.8%)	একলোগাইট	অপত্রায়ন
ভূ-পৃষ্ঠের কাছে আগ্নেয় উদ্বেধ	শেল	নিম্ন	সংস্পর্শ; হর্নফেল	কোয়ার্টজ, অ্যালবাইট, মাসকোভাইট, বায়োটাইট, এপিডোট, ক্লোরাইট, প্লাজিওক্লেজ, পাইরক্সিন	হর্নফেল	মধ্যম থেকে সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট সমা-কৃতি গ্রথন, অপত্রায়ন
চ্যুতিতল, থ্রাস্ট-চ্যুতিতল	যেকোন শিলা	নিম্ন	বিচূর্ণন; শিলাচূর্ণ	আদি শিলার অনুরূপ	মাইলোনাইট	সূক্ষ্মদানাযুক্ত
	ওপরের মত	নিম্ন	ওপরের মত	ওপরের মত	ফাইলোনাইট	পত্রায়ন

টীকা : ওমফাসাইট হল এক ধরনের পাইরক্সিন।

6.7.2 ভূমিরূপ গঠনে শিলাগুণের প্রভাব

ভূমিরূপ গঠনে শিলাগুণের প্রভাব বিশ্লেষণের জন! প্রথমে জানা দরকার কি কি বিষয়ের ওপর শিলার ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে। এর পরে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, ভূমিরূপ গঠনে ক্ষয় প্রতিরোধকারী শিলার প্রভাব কেমন হতে পারে। নীচে এই দুই বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

6.7.2.1 ক্ষয় প্রতিরোধে শিলার শাসন

কাঠিন্য (Hardness) ঃ শিলার কাঠিন্য বলতে শুধুমাত্র শিলা গঠনকারী খনিজের ভৌত কাঠিন্যকেই বোঝায় না, আবহিক বিকারের প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও শিলা কাঠিন্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বালি বা কোয়ার্টজের ভৌত কাঠিন্য ক্যালসাইট খনিজ থেকে বেশি। এর অর্থ অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় কর্দম ও ক্যালসাইট থেকে বালি কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার যে সমস্ত শিলায় খনিজ রাসায়নিক ও যান্ত্রিক আবহিক বিকার প্রতিরোধ করে, সেগুলো কঠিন শিলারূপে প্রতিভাত হয়। বালি ও কর্দম খনিজ রাসায়নিক আবহিক বিকারের অবশেষে পদার্থ (end product) বলে বেলে পাথর বা শেল পাথর দারণহীন চুনাপাথর থেকে কঠিন শিলা হিসাবে আচরণ করে। কারণ চুন সহজেই রাসায়নিক আবহিক বিকারপ্রাপ্ত হয়। আগ্নেয় শিলায় গাঢ় রঙের খনিজগুলো অপেক্ষাকৃত দ্রুত আবহিক বিকার প্রাপ্ত হয় বলে গাঢ় রঙের ক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলার হাল্কা রঙের আম্লিক শিলা থেকে তাড়াতাড়ি রাসায়নিক আবহিকবিকার ও ক্ষয় হবার প্রবণতা থাকে। খনিজের রাসায়নিক সংযুতি ছাড়াও শিলার গ্রথন, পাললিক শিলার সিমেন্ট প্রাপ্তির ভাল-মন্দ প্রভৃতি শিলার আবহিক বিকার ও ক্ষয়কার্যে প্রভাব বিস্তার করে।

এটা স্বাভাবিক যে, ক্ষয় প্রতিরোধ, করে কঠিন শিলার উচ্চভূমির সৃষ্টি করার ঝোঁক থাকবে। কোয়ার্টজাইট পাথর খুব কঠিন বলে আরাবল্লী ও পূর্বঘাট পর্বতে এই পাথরের ওপর সাধারণত শৈলশিরা গঠিত হতে দেখা যায়।

প্রবেশ্যতা ঃ প্রধানত প্রবাহিত জলধারার সাহায্যেই ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই যদি কোন শিলা জলের নিম্ন গমনে সহায়তা করে তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে জলপ্রবাহ কমে ও ঐ শিলার ওপর ক্ষয়কার্য হ্রাস পায়। এই জন্য যে শিলার প্রবেশ্যতা যত বেশি সেই শিলা তত বেশি ক্ষয় প্রতিরোধ করে। বেলে পাথর সুপ্রবেশ্য বলে ক্ষয় প্রতিরোধ করে। চুনাপাথরের ক্যালসাইট খনিজের ভৌত কাঠিন্য কম ও সহজেই রাসায়নিক আবহিক বিকার প্রাপ্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও সাধারণত চুনাপাথর ক্ষয়-প্রতিরোধকারী শিলা হিসাবে আচরণ করে। এর কারণ, চুনাপাথরে সাধারণত প্রচুর সংখ্যায় গভীর দারণ ও ফাটল থাকে আর এর ভেতর দিয়ে জল সহজেই নীচে চলে যেতে পারে। কাজেই চুনাপাথরের সুপ্রবেশ্যতাই একে ক্ষয়-প্রতিরোধের ক্ষমতা দেয় (ব্যাখ্যাসহ উদাহরণের জন্য চিত্র ঃ 6.14 দ্রষ্টব্য)। অবশ্য দুই পাশের শিলা চুনাপাথরের থেকেও সুপ্রবেশ্য হলে চুনাপাথর উচ্চভূমি সৃষ্টি না করে নিম্নভূমিও সৃষ্টি করতে পারে।

গৌণ শিলা গঠন ঃ দারণ, সম্ভেদ, সিস্ট বা পত্রায়ন, স্তরায়ন তল প্রভৃতি গৌণ শিলা গঠনগুলো শিলার ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সাধারণভাবে হ্রাস করে। দেখা যায়, অগভীর দারণ ক্ষয়কার্যে সহায়তা করে, কারণ প্রবাহিত জলের ধাক্কায় দারণ দিয়ে আবদ্ধ শিলাখণ্ড সহজেই উৎপাটিত হতে পারে। কিন্তু দারণ সুগভীর হলে জলের নিম্ন গমন বাড়ে (অর্থাৎ প্রবেশ্যতা বাড়ে) ও শিলার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

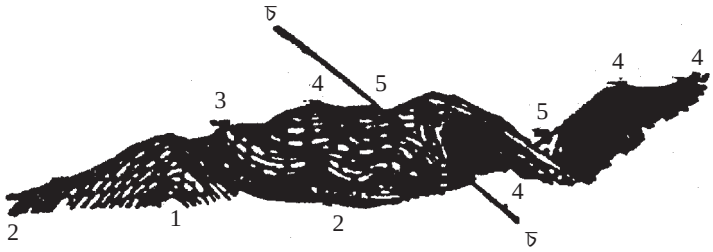

চিত্র 6.14 : *খণ্ডিস অঞ্চলে জুরাসিক ও ক্রিটেশাস যুগের শিলা গঠিত অঞ্চলের ভূতত্ত্বীয় প্রস্থচ্ছেদ। (1) কিয়োটো চুনাপাথর, (2) স্ফিতি শেল, (3) গিউমাল বেলেপাথর, (4) ক্রিটেশাস ফ্লিশ, (5) ক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলা*

ভূমিরূপ গঠনে শিলা প্রবেশ্যতার প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওপরের প্রস্থচ্ছেদ থেকে দেখা যায় 600 মি.-এর বেশি গভীর প্রবেশ্য কিয়োটো চুনাপাথর ক্ষয় প্রতিরোধ করে পাঞ্জাব হিমালয়ের দিকে মুখ করে এক খাড়া তলের সৃষ্টি করেছে। এর পাশে ভঙ্গুর স্পিতি শেল উপত্যকা গঠন করেছে। চুনাপাথরে সাধারণত প্রচুর সংখ্যায় গভীর দারণ ও ফাটল থাকে, আর এর ভেতর দিয়ে জল সহজেই নীচে চলে যেতে পারে। কাজেই চুনাপাথরের সুপ্রবেশ্যতাই একে ক্ষয় প্রতিরোধে সাহায্য করে।

খনিজ সম্ভেদ, সিস্ট গঠন ও স্তরায়ন-তল শিলার অভ্যন্তরে জলের অনুপ্রবেশে সাহায্য করে ও রাসায়নিক আবহিক বিকারকে ত্বরান্বিত করে এবং শিলার ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

6.7.2.2 ভূমিরূপ গঠনে ক্ষয়-প্রতিরোধের প্রভাব

সম্মিলিত শিলার গুরুত্ব ঃ যদি মধ্যম প্রকারের ক্ষয় প্রতিরোধকারী শিলা এক ক্ষেত্রে দুটো কম ক্ষয়-প্রতিরোধকারী শিলার মধ্যে, বা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষয়-প্রতিরোধকারী শিলার মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে ঐ মাঝারি ক্ষয় প্রতিরোধকারী শিলা প্রথম ক্ষেত্রে শৈলশিরা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপত্যকার সৃষ্টি করে (ব্যাখ্যা সহ উদাহরণের জন্য চিত্র ঃ 6.15 দ্রষ্টব্য)।

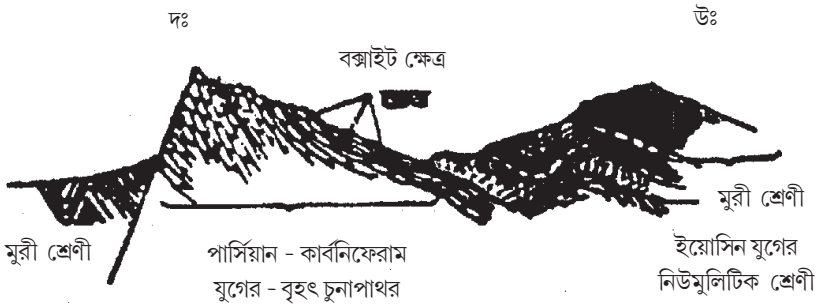

চিত্র 6.15 : *জম্মু পাহাড়ে পার্মিয়ান, কার্বনিফেরাস ও ইয়োসিন যুগের শিলাগঠিত অঞ্চলে ভূতত্ত্বীয় প্রস্থচ্ছেদ এঁকে ভূমিরূপ গঠনে সন্নিহিত শিলাস্তরের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঊর্ধ্বে অবস্থিত ইয়োসিন-মুরী শ্রেণী শিলার ক্ষয়প্রাপ্তির পরে পার্মিয়ান কার্বনিফেরাস যুগের চুনাপাথর ক্ষয় প্রতিরোধ করেছে ও পার্শ্ববর্তী মুরী শ্রেণীর শিলা বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। প্রস্থচ্ছেদের ডানপাশে ঐ একই মুরী শ্রেণীর শিলা (পর্যায়ক্রমে বেলেপাথর ও শেল গঠিত) সন্নিহিত পাতলাস্তর সমন্বিত ও ক্ষয়প্রবণ ইয়োসিন যুগের চুনাপাথর থেকে বেশি ক্ষয় প্রতিরোধ করে উচ্চভূমি গঠনে সাহায্য করেছে।*

6.7.3 নতির প্রভাব

নির্দিষ্ট ঃ বেধযুক্ত কোনও শিলাস্তর ভূ-পৃষ্ঠে কতখানি অঞ্চল জুড়ে প্রকাশিত হবে তা নির্ভর করে ঐ শিলার নতির ওপর। যদি শিলাস্তর উল্লম্ব থাকে, তাহলে বেধের সমান অঞ্চল জুড়ে ঐ শিলা ভূ-পৃষ্ঠে দেখা যাবে। অপরপক্ষে ঐ স্তর যদি অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে, তাহলে ঐ শিলা অনেক বেশি স্থান জুড়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত হবে। নতি যত কম হয়, একটা শিলাস্তর তত বেশি জায়গা জুড়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়। যদি এই শিলা ক্ষয়-প্রতিরোধকারী হয়, তাহলে অনুভূমিক বা অল্প নতিযুক্ত শিলা বিস্তৃততর উচ্চভূমির সৃষ্টি করে (ব্যাখ্যাসহ উদাহরণের জন্য চিত্র ঃ 6.16 দ্রষ্টব্য)।

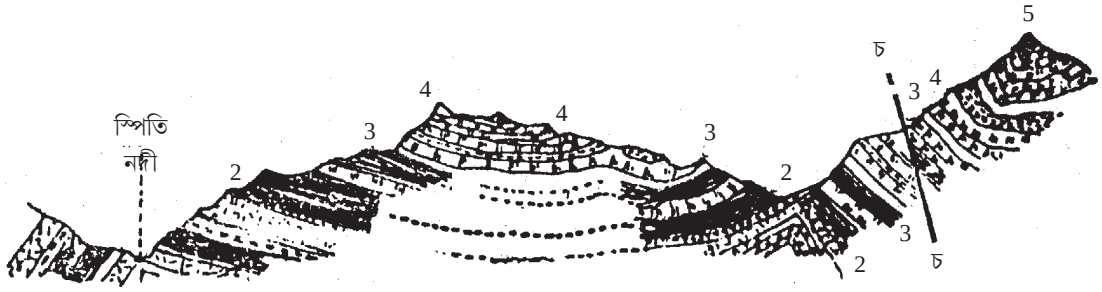

চিত্র 6.16 : *স্পিতি অঞ্চলে কার্বনিফেরাস থেকে ট্রায়াসযুগের শিলাগঠিত অঞ্চলের ভূতত্ত্বীয় প্রস্থচ্ছেদ এঁকে ভূমিরূপ গঠনে শিলাস্তরের নতির প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 1. পো. শ্রেণী, 2. ভূমিদেশ কংগ্লোমারেট সমন্বিত প্রোডাক্টাস শেল, 3. নিম্ন ট্রায়াস, 4. মুসেলকাল্ক (প্রধানত চুনাপাথর), 5. উর্ধ্ব ট্রায়াস।*

প্রদত্ত প্রস্থচ্ছেদের মধ্যাংশে মুসেলকল্ক শিলা শ্রেণীর কম নতির জন্য উচ্চভূমির বিস্তার বেশি হয়েছে। অথচ চ্যুতিরেখার (চ) বাঁপাশে ঐ একই শ্রেণীর শিলার নতি বেশি হওয়ায় উচ্চভূমির বিস্তার কম হয়েছে।

6.7.4 আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলার বিশেষ গুণাগুণের প্রভাব

বৈষম্যমূলক শিলাগুণের জন্য প্রত্যেক প্রকার শিলারই ভূমিরূপের ওপর কিছু প্রভাব রয়েছে, তবে আগ্নেয় শিলা ও চুনাপাথরের ওপর গঠিত ভূমিরূপের স্বকীয়তা সহজেই নজরে পড়ে। এখানে আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলার বিশেষ গুণাপুণ কিভাবে ভূমিরূপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে প্রধানত তা আলোচনা করা হল।

(i) **আগ্নেয় শিলা ঃ** ব্যাসল্ট ও ইগনিম্ব্রাইট প্রবাহ সমতল শীর্ষবিশিষ্ট লাভা মালভূমির সৃষ্টি করে কিন্তু এর পার্শ্বদেশ সিঁড়ির মত কতকগুলো ধাপ সৃষ্টি করে বেশ খাড়াভাবে নেমে যায়। ব্যাসল্টের বহুভূজাকৃতি দারণ, লাভা ও ভস্মস্তরের পালাক্রমে সঞ্চয় বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যকে প্রভাবিত করে ধাপের সৃষ্টি করে। কিন্তু মালভূমির শীর্ষদেশে নদীর ক্ষয়কার্য খুবই সীমিত থাকে, কারণ দারণ, প্রবেশ্য ভস্মস্তর

ও লাভা প্রবাহকালে সৃষ্ট বিভিন্ন গর্তের মধ্যে দিয়ে জল বহুল পরিমাণে নীচে ধাবিত হয়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে জলপ্রবাহ এতই কম থাকে যে, যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়কার্য হতে পারে না। এই জল প্রস্রবণ আকারে এই মালভূমির প্রান্তদেশে বহির্গত হয় ও ব্যাসল্টের ভূমিদেহে বর্ধিত হয়ে আবহিক বিকার ও নিম্ন খনন (undermining বা sapping) করে। ফলে ক্ষয়কার্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় ও ধ্বংসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই জন্য লাভা মালভূমির পার্শ্বদেশ বেশ খাড়া হয়। অনেক সময় লাভা মালভূমির প্রান্তদেশে সৃষ্ট নদী গিরিখাতের উৎস অংশে বাক্সের মত দেখতে এক গর্তের ভেতর দিয়ে অনেক প্রস্রবণ বহির্গত হয়। একে প্রস্রবণ-অ্যাল্‌কভ্ (spring alcove) বলে।

ভস্ম শঙ্কু সাধারণভাবে ক্ষয় প্রতিরোধ করে, কারণ এর সুপ্রবেশ্যতা। কিন্তু বৃহদাকৃতি স্তর আগ্নেয়গিরিতে (যেখানে পালাক্রমে ভস্ম ও লাভা সঞ্চিত হয়) ক্ষয়কার্য প্রবল হয়। পালাক্রমে ভস্ম ও লাভা সঞ্চয় ও অধিক উচ্চতা এ বিষয়ে সাহায্য করে। এই আগ্নেয়গিরির পার্শ্বদেশে যে প্রতিসারী (radiating) খাতভূমির সৃষ্টি হয়, তা ক্রমশ আয়তনে ও গভীরতায় বাড়তে থাকে এবং কালক্রমে কোনও এক স্থানে ভস্মস্তর ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ভস্মস্তরের ভেতর দিয়ে জল সহজে চুঁয়োতে পারে বলে এর ভূমিদেশে প্রস্রবণ দেখা দেয়। এই অংশে আবহিক বিকার, নিম্নখনন, পুঞ্জ ক্ষয় বৃদ্ধির ফলে উপত্যাকার শীর্ষদেশে প্রশস্ত গর্তের সৃষ্টি হয়।

উদ্বেধী আগ্নেয় শিলার মধ্যে গ্রানাইট প্রধান ও ভূমিরূপ গঠনে এর প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে বলা যায়, যে পাললিক শিলার নীচে গ্রানাইটের উদ্বেধ ঘটে তার থেকে গ্রানাইট কঠিন শিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্ষয়কার্যের পর যখন গ্রানাইট ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়, তারপর থেকে পললিক শিলার তুলনায় বেশি ক্ষয় প্রতিরোধ করে এই শিলা উচ্চভূমিক সৃষ্টি করে। ভঙ্গিল পর্বতের অষ্ঠিতে সুদীর্ঘ গ্রানাইট পাথরের উদ্বেধ থাকে। ক্ষয়কার্যের ফলে অনাবৃত এই গ্রানাইট ক্ষয় প্রতিরোধ করে শৈলশিরা বা শ্রেণীর সৃষ্টি করে। স্কটল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভঙ্গিল পর্বতের সঙ্গে যুক্ত এরকম অনেক শৈলশিরা দেখা যায়।

গ্রানাইট শিলাতে দারণ্যের উপস্থিতি অনুপুঙ্খ ভূমিরূপ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। সুগভীর দারণ-সমৃদ্ধ অঞ্চলে ফাটলের মধ্যে দিয়ে জল সহজেই নীচে চলে যেতে পারে ও আবহিক বিকারের ফলে কোর স্টোন ও টবের সৃষ্টি হয়। টব প্রায়শই তরঙ্গায়িত ভূমির ওপর টিলার মত দাঁড়িয়ে থাকে। অপরপক্ষে দারণ যদি অগভীর হয়, তাহলে প্রবাহিত জলের ধাক্কায় দারণ-আবদ্ধ শিলাখণ্ড উৎপাটিত হয় এবং এই অংশে ক্ষয় বেশি হয় বলে ছোট ছোট নদীর উপত্যকার সৃষ্টি হয়।

(ii) **পাললিক শিলা ঃ** ভূ-পৃষ্ঠে যে তিনটি শ্রেণীর পাললিক শিলা ব্যাপকভাবে দেখা যায় তা হল বালুকাময়, কর্দমময় ও চুনময় পাললিক শিলা। এই তিন শ্রেণির কতকগুলো বৈষম্যমূলক শিলাগুণ রয়েছে যা ভূমিরূপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নীচে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(a) **বালুকাময় শিলা গঠিত ভূমিরূপ ঃ** বেলেপাথর যদি জেলি সিলিকা দিয়ে সিমেন্ট প্রাপ্ত হয় তা হলে এই শিলা বিশেষ ক্ষয় প্রতিরোধকারী শিলায় পরিণত হয়। এর কারণ সিলিকা বা বালি যা দিয়ে বেলেপাথর তৈরি হয় তা রাসায়নিক আবহিক বিকারে প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। এছাড়া বালির ভৌত কাঠিন্য প্রধান শিলা গঠনকারী খনিজগুলোর তুলনায় বেশি। এরকম শিলা সাধারণত দারণ সমৃদ্ধ হয় ও তার জন্য সুপ্রবেশ্য হয়। এইজন্য অন্যান্য অবস্থা, যেমন—বৃষ্টিপাত, প্রাথমিক ভূমির ঢাল ইত্যাদি সমরূপ থাকলে এরকম বেলেপাথরের ওপর নদীর ঘনত্ব সাধারণভাবে কম হয়।

ভালভাবে লৌহ-অক্সাইড দিয়ে সিমেন্ট প্রাপ্ত হলেও বালুকাময় পাললিক শিলা কঠিন শিলা হিসাবে আচরণ করে। এরকম শিলায় 20-30% রন্ধ্র পরিসর অধিকার করে থাকে ও এতে শিলার প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি পায়। সুপ্রবেশ্যতাই এরকম বেলেপাথরের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বালুকাময় শিলা যদি ভালভাবে লৌহ-অক্সাইড দিয়ে সিমেন্ট প্রাপ্ত না হয়, তাহলে এটা সহজেই আবহিক বিকার ও ক্ষয়ের অধীন হয়।

চুন দিয়ে সিমেন্ট প্রাপ্ত বালুকাময় শিলাও বেশ ক্ষয় প্রতিরোধক হয়। ভালভাবে সিমেন্ট প্রাপ্তি ও সুপ্রবেশ্যতাই এর প্রধান কারণ।

সাধারণত বালুকাময় এবং কর্দমময় পাললিক শিলার স্তর পাশাপাশি থাকে, আর কর্দমময় পাললিক শিলার তুলনায় বেশি ক্ষয় প্রতিরোধ করে বালুকাময় শিলা উচ্চভূমি, ভৃগু, মেসা, বিউট (butte) প্রভৃতি গঠন করে।

(b) **কর্দমময় পাললিক শিলা ঃ** কর্দমময় পাললিক শিলা সাধারণত কোমল শিলা হিসাবে প্রতিভাত হয় ও প্রায়শই অবন্ধুর নিম্নভূমি বা উপত্যকা সৃষ্টি করে। যদিও উষ্ণ ও আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল ছাড়া কর্দম খনিজ রাসায়নিক আবহিক বিকারে নিষ্ক্রিয়, তবুও এর ভৌত কাঠিন্য কম বলে অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। কলিকরণ আবহিক বিকার প্রক্রিয়াও কর্দমময় পাললিক শিলার ভাঙনে সাহায্য করে। এ ছাড়া কর্দম কণার মধ্যে যে সব রন্ধ্র থাকে তা জলের পাতলা আস্তরণ (water film) দিয়ে ভরা থাকে ও কর্দম কণাগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে এবং কর্দমময় শিলাকে অস্থিতিস্থাপক বা প্লাস্টিক করে তোলে। রন্ধ্র পরিসর সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ জল আস্তরণ দিয়ে ভর্তি থাকে বলে এই শিলা মূলত অপ্রবেশ্য শিলায় পরিণত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠে জল ধরার প্রবাহ ও ভূমিক্ষয় বাড়ে। এইসব কারণে কর্দমময় পাললিক শিলা যে শুধুমাত্র দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাই নয়, এর ওপর নদীর বুননও (texture) বেশ সূক্ষ্ম প্রকৃতির হয়। সাধারণত এই ধরনের শিলায় দারণের অভাব লক্ষ্য করা যায়, আর গঠনগত নিয়ন্ত্রণের অভাবে কর্দমময় শিলার ওপর উৎপন্ন নদী-নকশা বৃক্ষরূপী (dendritic) হয়ে থাকে।

(c) **চুনময় পাললিক শিলা ঃ** চুনাপাথর, ড়লোমাইট, খড়ি পাথর প্রভৃতি শিলার প্রধান খনিজ ক্যালসাইটের ভৌত কাঠিন্য কম ও সছিদ্রতাও কম। এই অবস্থায় চুনময় পাথর দ্রুত ক্ষয় হবার কথা,

কিন্তু চুনাপাথরের এক বিশেষ গুণ হল দারণ-সমৃদ্ধি, বা একে ক্ষয় প্রতিরোধকারী করে তোলে। যদি হেলানো অবস্থায় কর্দমময় শিলার পাশে চুনময় শিলা অবস্থান করে, তাহলে এরা সাধারণত ক্ষয় প্রতিরোধ করে শৈলশিরা, খাড়া ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

চুনময় শিলার আর একটা বিশেষ গুণ হল এর দ্রাব্যতা (জলে দ্রবীভূত কার্বন ড়াই-অক্সাইড়ের সাহায্যে)। এর সঙ্গে সমৃদ্ধ দারণ্যের যোগাযোগ ঘটে। ফলে এইসব দারণ্যের ভেতর দিয়ে নিম্নগামী জল সব সময়ই কিছু পরিমাণ চুনকে দ্রবীভূত করে সঙ্গে নিয়ে যায়। এতে দারণ্যের ফাঁক বেড়ে কালক্রমে ডোলিন, সোয়ালো হোলের মত অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়। এইসব গর্তের ভেতর দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের জল ক্রমবর্ধমান হারে ভূ-নিম্নে চালিত হয় ও শুষ্ক নদী উপত্যকার সৃষ্টি হয়। ভূ-নিম্নে এই বিপথগামী জল সুড়ঙ্গ পথে প্রবাহিত হয় ও সবিস্তৃত গহ্বরের সৃষ্টি করে। যেখানে চুনাপাথর অনুভূমিক বা অল্প নাতিকোণ করে থাকে ও বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি করে, সেখানেই উপরোক্ত ধরনের ভূমিরূপ সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(iii) **রূপান্তরিত শিলা ঃ** চুনাপাথর বা গ্রানাইট পাথরের ওপরের বৈশিষ্ট্যমূলক ভূমিরূপের মত রূপান্তরিত শিলার ওপর গঠিত ভূমিরূপে সুনির্দিষ্টতা দেখা যায় না। বিভিন্ন রূপান্তরিত শিলার তুলনামূলক ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা স্থির করাও অসুবিধাজনক, কারণ নাইস, সিস্ট, কোয়ার্টজাইট, শ্লেট, মার্বেল প্রভৃতি রূপান্তরিত শিলার স্তর, ব্যান্ড বা পটি, সম্ভেদ, বিদার্যতা প্রভৃতি জটিল গঠন এতই সূক্ষ্ম প্রকৃতির যে, ক্ষয়কার্যের প্রভাবে উৎপন্ন ভূমিরূপে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়া অধিকাংশ রূপান্তরিত শিলা খুবই প্রাচীন ও ভূ-পৃষ্ঠের বহু নীচে এর উৎপত্তি হয়। কাজেই ক্ষয়কার্যের ফলে এরা যখন ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়, তখন এদের অবস্থান নিম্ন অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে। এরকম নিম্ন অবস্থান এদের কম ক্ষয় প্রতিরোধকারী ক্ষমতাকে নির্দেশ করে না। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও কতকগুলো বিশেষ অঞ্চলের সমীক্ষা থেকে বিভিন্ন রূপান্তরিত শিলার ক্ষয়-প্রতিরোধ বিষয়ে কিছু সাধারণ সূত্র নির্দিষ্ট করা যায়।

(a) **কোয়ার্টজাইট ঃ** এই শিলা ভৌত ও রাসায়নিক—দুইভাবেই ক্ষয় প্রতিরোধ করে। ভূ-পৃষ্ঠে প্রধান শিলার মধ্যে একেই সবচেয়ে বেশি ক্ষয় প্রতিরোধকারী শিলা বলে মনে করা যায়। সাধারণত এই শিলা শৈলশিরা সৃষ্টি করে।

(b) **শ্লেট ঃ** অপ্রবেশ্যতা ও বেশি মাত্রায় সম্ভেদের উপস্থিতি এই শিলাকে ক্ষয়প্রবণ করে তোলে। সম্ভেদতল যদি ভূমির সঙ্গে হেলানো অবস্থায় থাকে (যা সাধারণত থাকে), তাহলে এই ক্ষয় প্রবণতা বিশেষ করে বৃদ্ধি পায়।

(c) **সিস্ট ঃ** গঠন অনুযায়ী সিস্টের আবহিক বিকার ও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে।

(d) **নাইস ঃ** নাইস পাথরের আচরণ অনেকটা গ্রানাইট শিলার মত ও মালভূমি অঞ্চলে টর সমন্বিত তরঙ্গায়িত ভূমি বা ভারের লাঘব জনিত গম্বুজাকৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।

কার্যকালের ব্যপ্তির প্রভাব ঃ যথেষ্ট সময় পেলেই শিলাগুণের পার্থক্যের জন্য নদী ও অন্যান্য ভাস্কর্য শক্তি বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্য করে ভূমির বন্ধুরতা সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণত ক্ষয়চক্রের পরিণত অবস্থায় নদীর সঙ্গে শিলাগুণের সম্পর্ক সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়, অর্থাৎ কোমল শিলার ওপর উপত্যকা ও কঠিন শিলার ওপর শৈলশিরা গঠিত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে ক্ষয়কার্যের স্বল্পতার জন্য কোমল ও কঠিন শিলা ভূ-পৃষ্ঠে বন্ধুরতা সৃষ্টিতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আবার বার্ধক্য অবস্থায় কোমল ও কঠিন দু'রকম শিলাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমির সৃষ্টি করে ও ভূ-পৃষ্ঠে এদের প্রভাব তেমন প্রকট হয় না।

6.8 সারাংশ

শিলা অশ্মমণ্ডল গঠনের প্রধান উপাদান। শিলা হল নানা ধরনের খনিজ বা মাণিক্যের সমষ্টি। শিলার কোন নির্দিষ্ট রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু খনিজের আছে। ভূ-ত্বকে প্রাপ্ত খনিজের 99%-ই দশটি মৌলিক উপাদানে তৈরি। এর মধ্যে অক্সিজেন এবং সিলিকনই ভূ-ত্বকের ওজনের শতকরা প্রায় 75 ভাগ অধিকার করে আছে। আগ্নেয় শিলা প্রকৃতির প্রাচীনতম শিলা। এছাড়া ভূ-ত্বক গঠনকারী অন্যান্য শিলারা হল পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা। প্রতিটি শিলাই নানা ধরনের ভূমিরূপ গড়ে তোলে। আসলে শিলার কাঠিন্য প্রবেশ্যতা, নতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ভূমিরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রভাব বিস্তার করে।

6.9 প্রশ্নাবলী

1) শিলা ও খনিজের তফাৎ কোথায়?
2) উদ্ভব অনুসারে আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগটি কেমন?
3) রাসায়নিক গঠন অনুসারে আগ্নেয় শিলাকে কি ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়?
4) পাললিক শিলাকে উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কি ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়?
5) শিলা কি ভাবে রূপান্তরিত হয়?

6.10 উত্তর সংকেত

1) উত্তরের জন্য 6.1 অংশ দেখুন।
2) উত্তরের জন্য 6.3.1 অংশ দেখুন।
3) উত্তরের জন্য 6.3.1 অংশ দেখুন।
4) উত্তরের জন্য 6.5 অংশ দেখুন।
5) উত্তরের জন্য 6.6.1 অংশ দেখুন।

একক 7 □ ভাঁজ বা বলি, চ্যুতি এবং ভূমিরূপের উপর তাদের প্রভাব

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা

7.2 উদ্দেশ্য

7.3 ভাঁজ বা বলির সংজ্ঞা ও গাঠনিক উপাদান

7.4 বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

7.4.1 গাঠনিক উপাদানের ভঙ্গির ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ

7.4.2 বলির পৃষ্ঠদেশের আকৃতির বর্ণনার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

7.4.3 বলির অন্তর্বাহু কোণের পরিমাণের ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ

7.4.4 বলিতে শিলাস্তরের বক্রতা ও স্থূলতার পরিবর্তনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

7.5 চ্যুতির সংজ্ঞা ও গাঠনিক উপাদান

7.5.1 চ্যুতির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

7.5.2 শিলাস্তরের চ্যুতির অবস্থিতির লক্ষণ

7.6 ভূমিরূপের উপর বলি ও চ্যুতির প্রভাব

7.7 সারাংশ

7.8 প্রশ্নাবলী

7.9 উত্তর সংকেত

7.10 প্রতিশব্দ

7.11 নির্বাচিত সহায়ক পুস্তক

7.1 প্রস্তাবনা

ভঙ্গিল পর্বতমালা (যেমন, হিমালয়, আল্‌প্‌স, রকি ইত্যাদি) ও পৃথিবীর পুরনো পাথরের শিলাস্তরে (বয়স 250 কোটি বছরের বেশি) অনেক বলি ও চ্যুতি দেখতে পাওয়া যায়। বলি ও চ্যুতি এই দুটি গঠন শিলাস্তরের আদি গঠন নয় অর্থাৎ এরা শিলাস্তরের উৎপত্তির সাথে সাথেই তৈরি হয় না। সমুদ্র, নদী, হ্রদে শিলাস্তর যখন তৈরি হয় তখন তারা অনুভূমিক বা প্রায়-অনুভূমিক থাকে। আপনারা জানেন, প্লেট টেক্‌টনিক্‌স তত্ত্ব বা পাত সংস্থান তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীর ভূত্বক স্থির নয়। ভূত্বকের এই অস্থিরতা বা সচলতাই শিলাস্তরে বলি ও চ্যুতি উৎপন্ন করে। বলি বলতে আমরা শিলাস্তরের ভাঁজ বুঝি (চিত্র : 7.1A),

আর চ্যুতি বলতে শিলাস্তরের বিস্থাপন (dislocation) বোঝায় (চিত্র : 7.1B)। বলি ও চ্যুতি খনি থেকে সম্পদ আহরণের কাজে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ পেট্রোলিয়ামের কথাই ধরা যাক। পেট্রোলিয়াম এক বিশেষ ধরনের শিলাস্তরে ঊর্ধ্বভঙ্গ বলিতে গ্যাস ও জলের মাঝখানে থাকে (চিত্র : 7.1C)। অধোভঙ্গ বলিতে এই তেল থাকেই না। তাই পৃথিবীর উপরিতল থেকে ভূছিদ্র এমনভাবে করতে হয় যে, তা যেন ঊর্ধ্বভঙ্গ বলিকে ভেদ করে। অধোভঙ্গ বলিতে এই ভূছিদ্র করলে তেল না পেয়ে পাওয়া যাবে জল। অনেক রৈখিক আকর দেহকে মানচিত্রে কিছুদূর যাবার পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, চ্যুতি অনেক ক্ষেত্রে এই আকর দেহকে বিস্থাপিত করে। চ্যুতির অবস্থান ও তার চলাচলের ইতিহাস জানলে তবেই ঐ আকর দেহকে আবার খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। কয়লা খনিতে কয়লার স্তরের এই ধরনের বিস্থাপন খুব লক্ষ্য করা যায় (চিত্র : 7.1D)। এছাড়াও বলি ও চ্যুতি ভূমিরূপকেও নানাভাবে প্রভাবিত

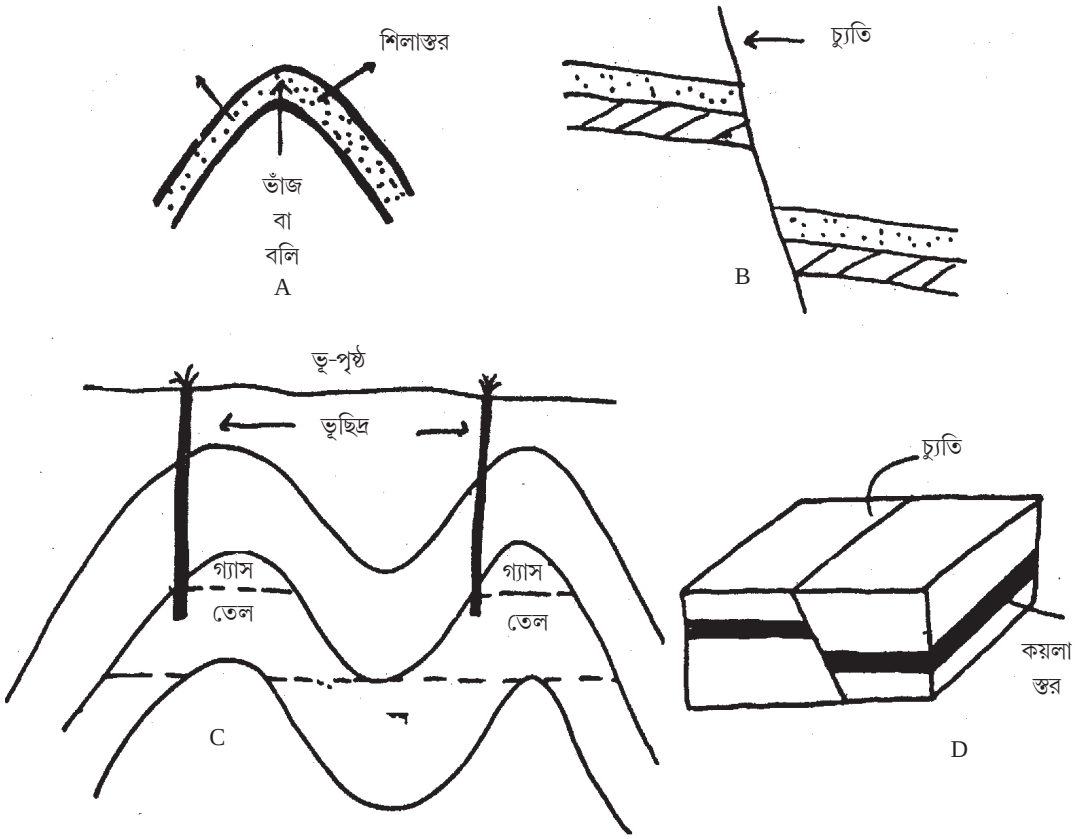

চিত্র 7.1

করে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। এবার আমাদের বলির সংজ্ঞা, গাঠনিক উপাদান, জ্যামিতি সম্পর্কে জানা দরকার। বলির পর আমরা চ্যুতি নিয়েও অনুরূপ আলোচনা করব।

7.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- পৃথিবীর ভূত্বকের বিভিন্ন পাথর ও শিলাস্তরের নানারকম গাঠনিক বিশেষত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- পাথর ও শিলাস্তরের গঠন ভূমিরূপকে কিভাবে প্রভাবিত করে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে পারবেন।
- সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি গঠন—ভাঁজ বা বলি (fold) এবং চ্যুতি (fault)—এদের সংজ্ঞা, বিশেষত্ব, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারবেন।

7.3 ভাঁজ বা বলির সংজ্ঞা ও গাঠনিক উপাদান

ভাঁজ বা বলি (fold) বলতে আমরা একটি বক্রতল বা বক্রতলের সমষ্টি বুঝি। পাথরে এই বক্রতল বা বক্রতলের সমষ্টি শিলাস্তরের আকৃতিগত পরিবর্তন বা বিরূপনের ফলে (deformation) সৃষ্টি হয়। বিরূপন ছাড়া অন্য কোনোভাবে তৈরি বক্রতলকে শিলাস্তরের বলি বলা হয় না। একটি বলির নানা গাঠনিক উপাদান থাকে, যেমন গ্রন্থিবিন্দু, গ্রন্থিরেখা, বাহু, অক্ষতল, আচ্ছাদন তল, বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও আন্তর্বাহু কোণ। এবার একে একে ছবির সাহায্যে এদের বর্ণনা করা যাক।

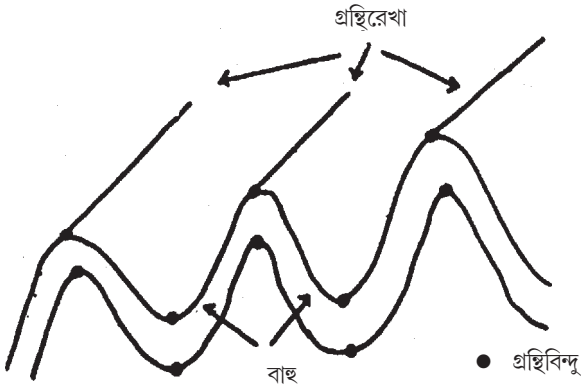

চিত্র 7.3A

গ্রন্থিবিন্দু ঃ একটি বক্রতলের বক্রতা $\left(c = \frac{1}{r}\right)$ সর্বত্র সমান নয়। যে বিন্দুতে এই বক্রতা সর্বাধিক, তাকেই আমরা গ্রন্থিবিন্দু বলি। এখানে c = বক্রতা এবং r = একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঐ বক্রতলের ব্যাসার্ধ। কোনো বক্রতলের বক্রতা সর্বাধিক কোন বিন্দুতে না হয়ে তা একটি বলয়ও সৃষ্টি করতে পারে। তখন তাকে গ্রন্থিবলয় বলা হয় এবং ঐ বলয়ের মধ্যবিন্দুকে গ্রন্থিবিন্দু নাম দেওয়া হয় (চিত্র : 7.3A)।

গ্রন্থিরেখা ঃ একটি বলির গ্রন্থিবিন্দুগুলি যোগ করলে যেল রেখা পাওয়া যায় তাকে গ্রন্থিরেখা বলে (চিত্র : 7.3A)।

বাহু ঃ গ্রন্থিবিন্দু একটি বলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে। এই প্রত্যেকটি ভাগকে বাহু বলে অর্থাৎ একটি বলি সবসময় দুটি বাহু দ্বারা গঠিত হয় (চিত্র : 7.3A)।

অক্ষ তল ঃ গ্রন্থিরেখাগুলি যোগ করলে যে তল পাওয়া যায় তাই হল অক্ষতল। অক্ষতল সাধারণত একটি বলিকে দুটি সমান অংশে ভাগ করে (চিত্র : 7.3B)।

আচ্ছাদন তল ঃ যে দুটি তলের সীমার মধ্যে বলি দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ ওঠানামা করে, তাদের বলে আচ্ছাদন তল (চিত্র : 7.3C)।

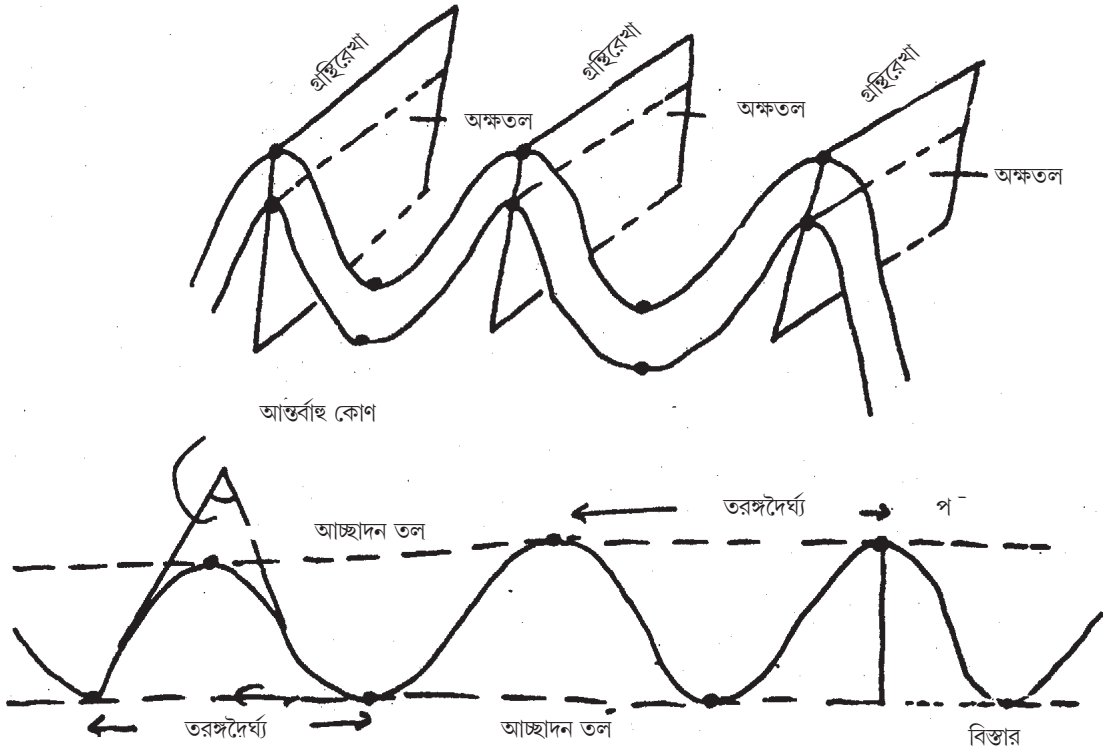

চিত্র 7.3 B

বিস্তার ঃ আচ্ছাদন তল দুটির মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তার অর্ধাংশকে বলে বিস্তার (চিত্র : 7.3C)।

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঃ বলি শিলাস্তরে যে তরঙ্গ তৈরি করে তার দুটি গ্রন্থিবিন্দুর মধ্যের দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে (চিত্র : 7.3C)।

আন্তর্বাহু কোণ ঃ বলির বাহু দুটিকে প্রসারিত করলে তারা একদিকে একটি কোণ তৈরি করে। এই কোণকে আন্তর্বাহু কোণ বলা হয় (চিত্র : 7.3C)।

7.4 বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ জানার আগে আপনাদের সরলরেখা এবং সমতলীয় গঠনের ভঙ্গি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। একটি সরল রৈখিক গঠনের ভঙ্গি তার ট্রেন্ড ও প্লাঞ্জ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। কোন সরল রৈখিক গঠন ঐ রেখাগামী উল্লম্ব সমতলে অনুভূমিক রেখার সাথে যে কোণ (angle) তৈরি করে তাকেই ঐ সরল রেখার প্লাঞ্জ (plunge) বলা হয়। আর ঐ সরল রৈখিক গঠন উল্লম্ব সমতল বরাবর উঠে এসে অনুভূমিক সমতলে যে দিক্ নির্দেশ করে, তাকে ঐ সরল রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড (trend) বলে। সমতলীয় গঠনের ভঙ্গি তার নতি (dip) ও নতির দিক নির্দেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। অথবা নতি ও তার স্ট্রাইক (strike) বা আয়াম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। কোন সমতলীয় গঠনের নতি বলতে আমরা ঐ সমতলীয় গঠন ও আনুভূমিক সমতলের মধ্যবর্তী কোণকে (angle) বুঝি। আর সমতলীয় গঠনের উপর অবস্থিত আনুভূমিক রেখার দিক নির্দেশকে গঠনটির স্ট্রাইক বা আয়াম বলে। স্ট্রাইকের সঙ্গে 90° কোণ করে সমতলটির নতির দিকে যে রেখা পাওয়া যায়, তাই হলো নতির দিক নির্দেশ (চিত্র : 7.4)। এবার বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগে আসা যাক। বলির শ্রেণীবিভাগ বলির নানা গাঠনিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে করা হয় যেমন—

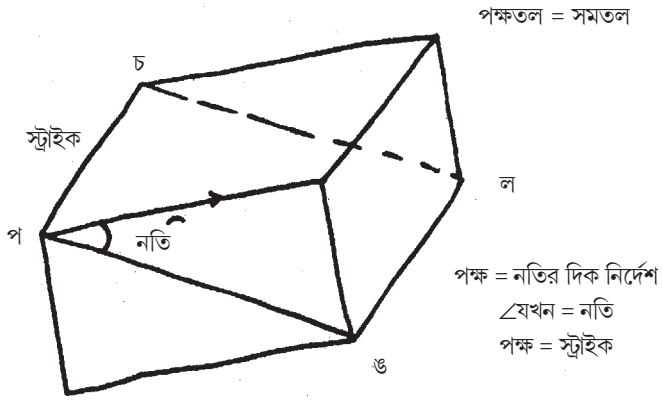

চিত্র 7.4

7.4.1 গাঠনিক উপাদানের ভঙ্গির ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ

1. **ঊর্ধ্বভঙ্গ বা অ্যান্টিফর্ম (Antiform) ঃ** শিলাস্তর বেঁকে বলি বা ভাঁজ সৃষ্টি করে। শিলাস্তরটি যদি উপরের দিকে বাঁক নেয়, তবে তাকে ঊর্ধ্বভঙ্গ বা অ্যান্টিফর্ম বলে। অ্যান্টিফর্মের দুই বাহুর নতির দিক নির্দেশ সাধারণত বিপরীতমুখী হয় (চিত্র : 7.4.1A)। অবশ্য সবসময় তা নাও হতে পারে।

2. **অধোভঙ্গ বা সিন্‌ফর্ম (Synform) ঃ** যে বলির বাঁক নীচের দিকে তাকে সিন্‌ফর্ম বলে। এদের দুই বাহু সাধারণত উভয় উভয়ের দিকে নতির দিক নির্দেশ করে (চিত্র : 7.4.1B)। তবে অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে।

3. **নিউট্রাল (Neutral) বলি ঃ** যে বলি উপরে বা নিচে বাঁক না নিয়ে পাশের দিকে বাঁক নেয় তাকে নিউট্রাল বলি বলা হয় (চিত্র : 7.4.1C)।

4. **আনুভূমিক বলি ঃ** যে বলির অক্ষতল ও গ্রন্থিরেখা আনুভূমিক হয়, তাকে আনুভূমিক বলি বলে (চিত্র : 7.4.1D)।

5. **উল্লম্ব বলি ঃ** যে বলির গ্রন্থিরেখা ও অক্ষতল উল্লম্ব থাকে তাকে উল্লম্ব বলি বলা হয় (চিত্র : 7.4.1E)।

6. **অবনত বলি ঃ** যে বলির গ্রন্থিরেখা অবনত অর্থাৎ অনুভূমিক নয়, তাকে অবনত বলি বলে (চিত্র : 7.4.1F)।

7. **অনাবনত বলি ঃ** যে বলির গ্রন্থিরেখা আনুভূমিক তাকে অনাবনত বলি বলা হয় (চিত্র : 7.4.1G)।

8. **শায়িত বলি ঃ** যে বলির অক্ষতলের নতি 0° থেকে 10° ডিগ্রির মধ্যে তাকে শায়িত বলি বলে।

9. **প্রণত বলি ঃ** যে বলির অক্ষতলের উপরে গ্রন্থিরেখা ও অক্ষতলের স্ট্রাইকের মধ্যে কোণ 80° থেকে 100° ডিগ্রির মধ্যে তাকে প্রণত বলি বলা হয় (চিত্র : 7.4.1H)।

10. **খাড়াই বলি ঃ** যে বলির অক্ষতল উল্লম্ব থাকে তাকে খাড়াই বলি বলে।

11. **আনত বলি ঃ** যে বলির অক্ষতলের নতি 10° থেকে 80°-র মধ্যে তাকে আনত বলি বলা হয়।

12. **বিপর্যস্ত বলি ঃ** যে বলির দুটি বাহুই একই দিকে নত তাকে বিপর্যস্ত বলি বলে। এই ধরনের বলিতে অ্যান্টিফর্ম ও সিন্‌ফর্মের বাহুদুটি সংজ্ঞা অনুসারে নতির দিক নির্দেশ করে না (চিত্র : 7.4.11)।

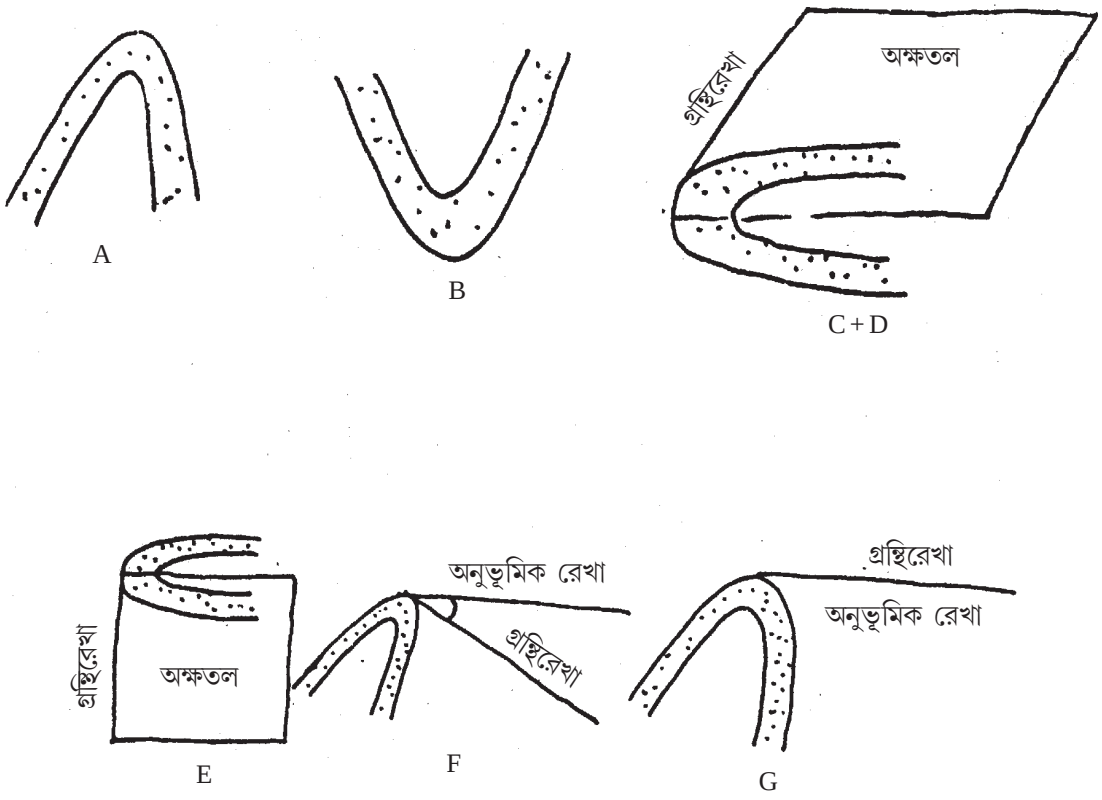
A
B
গ্রন্থিরেখা
অক্ষতল
C + D
গ্রন্থিরেখা
অক্ষতল
E
অনুভূমিক রেখা
গ্রন্থিরেখা
F
গ্রন্থিরেখা
অনুভূমিক রেখা
G
অক্ষতল
গ্রন্থিরেখা
উল্লম্ব রেখা
H
I

চিত্র 7.4.1

7.4.2 বলির পৃষ্ঠদেশের আকৃতির বর্ণনার ভিত্তিতে শ্রেণীবভাগ

1. **স্তম্ভাকার বলি :** যে বলির পৃষ্ঠদেশের যেকোন জায়গায় গ্রন্থিরেখার সমান্তরালে সরলরেখা টানা যায় তাকে স্তম্ভাকার বলি বলে।

2. **অস্তম্ভাকার বলি :** যে বলির পৃষ্ঠদেশে সব জায়গায় গ্রন্থিরেখার সমান্তরালে সরলরেখা টানা যায় না তাকে অস্তম্ভকার বলি বলা হয়।

3. **শঙ্কু আকার বলি :** যে অস্তম্ভাকার বলির আকার একটি শঙ্কু বা cone -এর অংশের মতো তাকে শঙ্কু আকার বলি বলে।

4. **প্রতিসম বলি :** প্রস্থচ্ছেদে যে বলির অক্ষতলের দুই পাশে বলির অংশের আকৃতি প্রতিসম হয় অর্থাৎ একটি অপরটির প্রতিবিম্ব সদৃশ, তাকে প্রতিসম বলি বলা হয় (চিত্র : 7.4.2A)।

5. **অপ্রতিসম বলি :** প্রস্থচ্ছেদে যে বলির অক্ষতলের দু'পাশের অংশ প্রতিসম হয় না তাকে অপ্রতিসম বলি বলে (চিত্র : 74.2B)। অপ্রতিসম বলির বাহু দুটির দৈর্ঘ্য অসমান হয়।

6. **তীক্ষ্ণ বলি :** এ ধরনের বলির গ্রন্থি তীক্ষ্ণ হয় অর্থাৎ বলির বাহুর তুলনায় গ্রন্থিবলয় খুব ছোট হয় (চিত্র : 7.4.2C)।

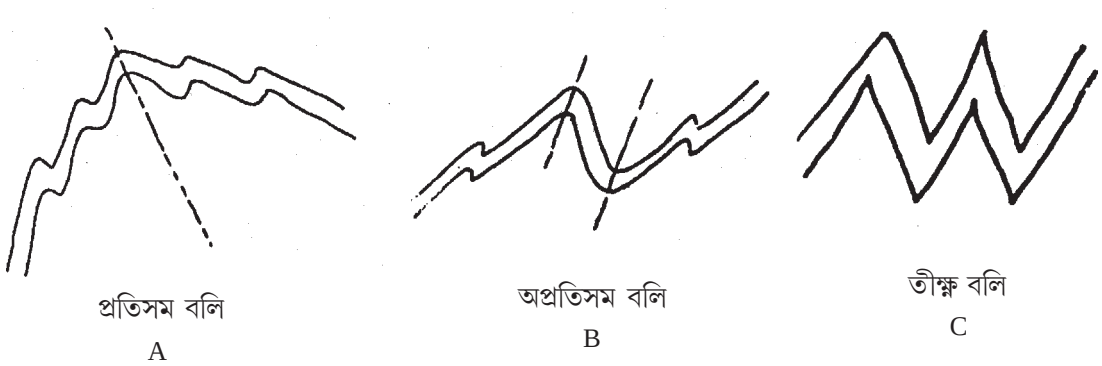

প্রতিসম বলি
A

অপ্রতিসম বলি
B

তীক্ষ্ণ বলি
C

চিত্র 7.4.2

7.4.3 বলির আন্তর্বাহু কোণের পরিমাণের ভিত্তিতে বলির শ্রেণিবিভাগ

বলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তার আন্তর্বাহু কোণের উপর নির্ভরশীল। ঐ কোণ যত ছোট হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় বিস্তার তত বেশি হবে অর্থাৎ বলিটিকে সরু ও লম্বা দেখাবে। আর্ন্তবাহু কোণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় (চিত্র : 7.4.3A) যথা :

আন্তর্বাহু কোণ

1. মৃদু বলি ..... 180°—120°
2. মুক্ত বলি ..... 120°—70°
3. বদ্ধ বলি ..... 70°—30°
4. সংকীর্ণ বলি ..... 30°—0°
5. সমভঙ্গ বা সমনত বলি ..... 0°

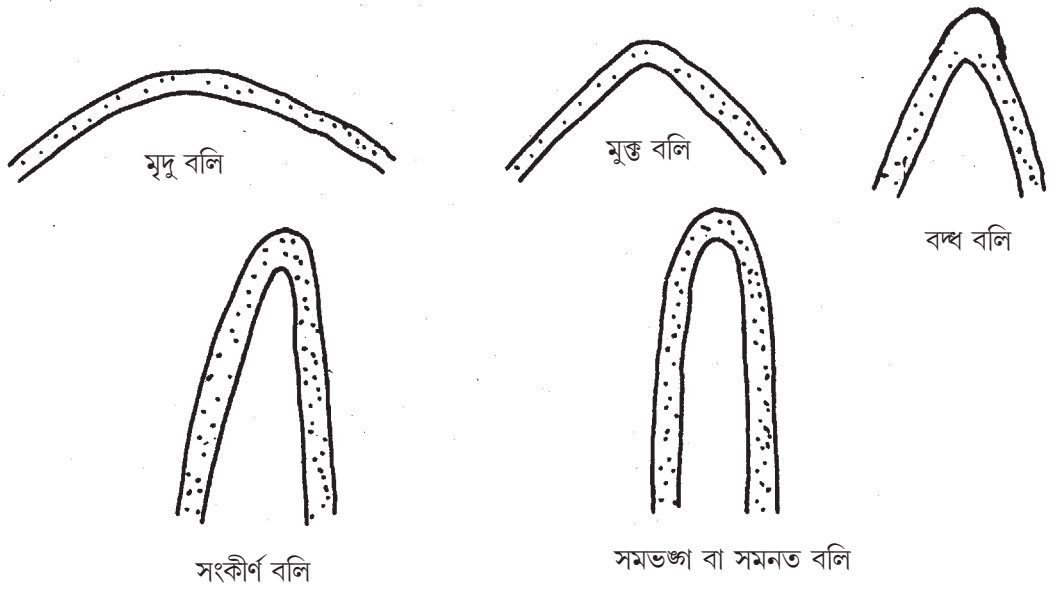

চিত্র 7.4.3A

7.4.3 বলিতে শিলাস্তরের বক্রতা ও স্থূলতা পরিবর্তনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

বলির উত্তল ও অবতল এই দুটি পৃষ্ঠ থেকে। গ্রন্থিবিন্দুর উভয় পাশে আলাদাভাবে উত্তল ও অবতল পৃষ্ঠের দুটি সমনতি বিন্দু যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায়, তাকে সমনতি রেখা (Dip Isogon) বলে। এই সমনতি রেখার বিন্যাস বলিতে শিলাস্তরের উত্তল ও অবতলের বক্রতা ও স্থূলতার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। সমনতি রেখার বিন্যাসের উপর নির্ভর করে বলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

1. **প্রথম শ্রেণী :** সমনতি রেখাগুলির বলির ক্রোড়ের দিকে (অর্থাৎ অবতলের দিকে) পরস্পরকে ছেদ করে। এই ধরনের বলিতে অবতলের বক্রতা উত্তলের বক্রতার চেয়ে বেশি হয়। এই ধরনের বলির গ্রন্থিবিন্দুতে শিলাস্তরের যা প্রকৃত স্থূলতা বা সমকোণিক স্থূলতা, সর্বত্রই সেই স্থূলতা দেখা যায় (চিত্র : 7.4.4A)।
2. **দ্বিতীয় শ্রেণী :** সমনতি রেখাগুলি বলি বরাবর সমান্তরাল থাকে। বলির উভয়তলের বক্রতা সমান হয়, গ্রন্থিবিন্দুতে স্থূলতা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং সেখান থেকে দু'দিকে বলি বরাবর তা কমতে থাকে (চিত্র : 7.4.4B)।
3. **তৃতীয় শ্রেণী :** সমনতি রেখাগুলি বলির উত্তল দিকে পরস্পর ছেদ করে। এইসব বলিতে অবতল পৃষ্ঠের বক্রতা উত্তল পৃষ্ঠের বক্রতার চেয়ে কম হয় এবং শিলাস্তরের স্থূলতা গ্রন্থিবিন্দুতে বলির বাহুর তুলনায় অনেক বেশি থাকে (চিত্র : 7.4.4C)।

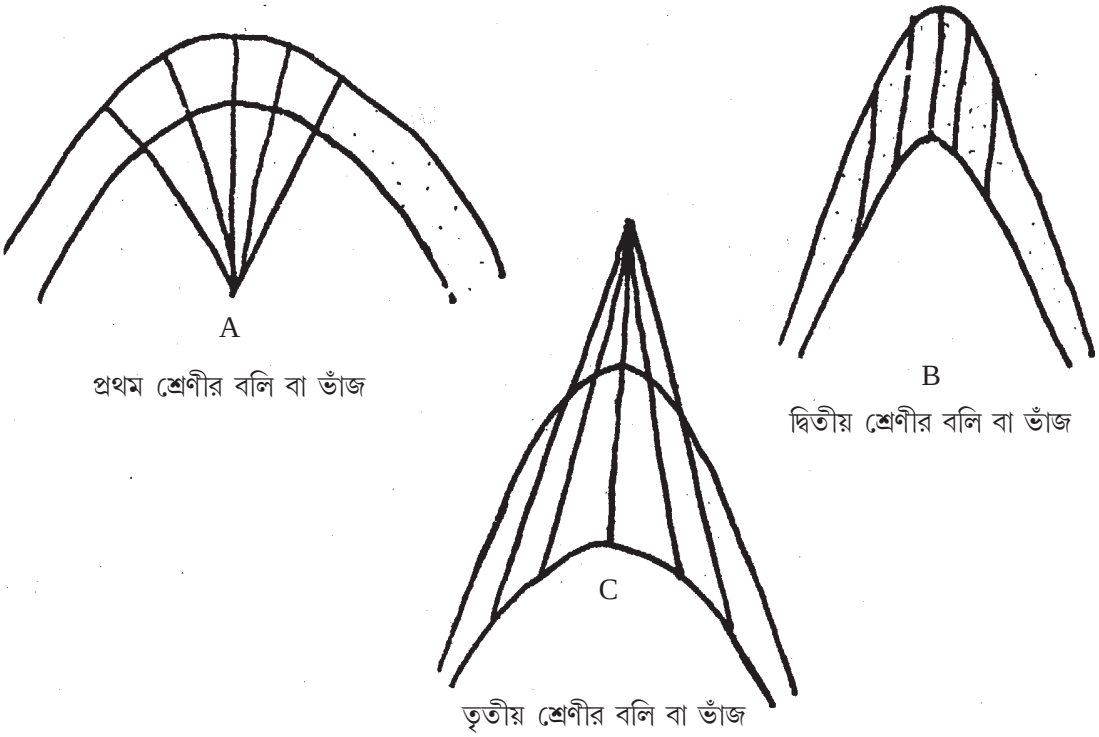

প্রথম শ্রেণীর বলি বা ভাঁজ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বলি বা ভাঁজ

তৃতীয় শ্রেণীর বলি বা ভাঁজ

চিত্র 7.4.4

7.5 চ্যুতির সংজ্ঞা ও গাঠনিক উপাদান

কোন ফাটল বরাবর যদি শিলাস্তরের বিস্থাপন (dislocation) ঘটে, তবে ঐ ফাটলকে আমরা চ্যুতি বলি। চ্যুতি সাধারণত একটি সমতলীয় গঠন হয় এবং যে কোন সমতলীয় গঠনের মতো তার নতি (dip), আয়াম বা স্ট্রাইক (strike) ইত্যাদি থাকে। চ্যুতির নতির পূরক কোণকে হেড বলা হয়। চ্যুতির নিচের শিলাস্তর বা পাথরের স্তূপকে অধোস্তূপ ও উপরের শিলাস্তর বা পাথরের স্তূপকে ঊর্ধ্বস্তূপ বলে (চিত্র : 7.5A)। ভূমিপৃষ্ঠে চ্যুতির ছেদরেখাকে চ্যুতির উদ্ভেদ, ছেদরেখা বা চ্যুতিরেখা বলে। চ্যুতি সৃষ্ট হওয়ার আগে চ্যুতির তলে পরস্পরের উপর লেগে থাকা দুটি বিন্দুকে চ্যুতি সৃষ্টির পর আর এক বিন্দুতে পাওয়া যায় না। তারা একে অন্যের থেকে দূরে সরে যায়। চ্যুতির তল বরাবর ঐ দুটি বিন্দুর যোজক রেখাকে চ্যুতির প্রকৃত স্থলন বা নেট স্লিপ বলা হয়। চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সমান্তরালে নেট স্লিপের উপাংশকে স্ট্রাইক স্লিপ এবং নতির সমান্তরাল উপাংশকে ডিপ্ স্লিপ বলে (চিত্র : 7.5B)। চিত্রে পব নেট স্লিপ, পভ স্ট্রাইক স্লিপ ও পম ডিপ স্লিপ। চ্যুতির স্ট্রাইকের সমকোণীয় উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদে চ্যুতি বরাবর শিলাস্তরের যে বিস্থাপন ঘটে, তাকে নতিবিচ্ছেদ বা ডিপ সেপারেশন বলা হয়। আর নতি বিচ্ছেদের উল্লম্ব বরাবর উপাংশ হল থ্রো (Throw) ও আনুভূমিক উপাংশ হল হিভ্ (Heave)।

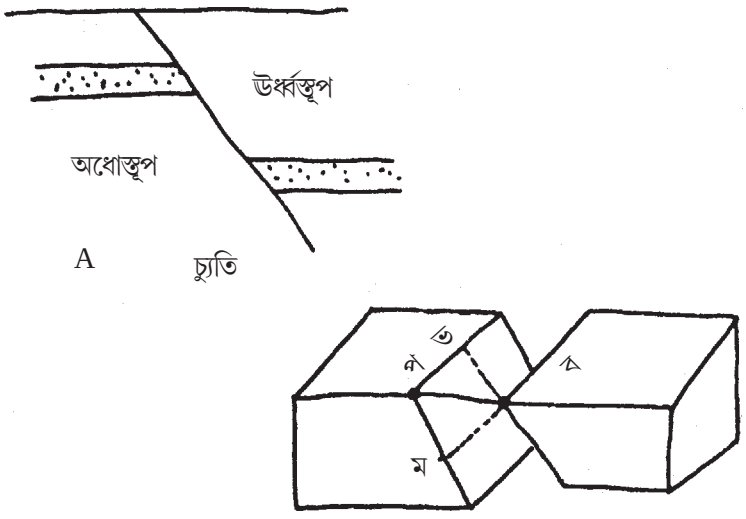

A

B

পব = নেট স্লিপ
পম = ডিপ স্লিপ
পভ = স্ট্রাইক স্লিপ

চিত্র 7.5

7.5.1 চ্যুতির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন ভিত্তির উপর নির্ভর করে চ্যুতির নানারকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

(A) নেট স্লিপের ভঙ্গির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ : নেট স্লিপের ভঙ্গির ভিত্তিতে তিন রকমের চ্যুতি দেখা যায়।

1. **স্ট্রাইক স্খলন চ্যুতি :** এই ধরনের চ্যুতিতে নেট স্লিপের ভঙ্গি চ্যুতিতলে চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সমান্তরাল হয়। ইহা চ্যুতি দ্বারা বিস্থাপিত শিলাস্তরের স্ট্রাইক বা নতির উপর নির্ভরশীল নয় (চিত্র : 7.5.1 Aa)।

2. **নতি স্খলন চ্যুতি :** এই চ্যুতিতে নেট স্লিপ চ্যুতিতলের নতির সমান্তরাল হয়। চ্যুতিতলে নেট স্লিপ চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সঙ্গে 90^{o} কোণ উৎপাদন করে। এই ধরনের চ্যুতিও শিলাস্তরের স্ট্রাইক বা নতির উপর নির্ভরশীল নয় (চিত্র : 7.5.1Ab)।

3. **তির্যক স্খলন চ্যুতি :** চ্যুতিতলের উপর নেট স্লিপের সঙ্গে চ্যুতির স্ট্রাইকের কোণ 10^{o}-র বেশি এবং 80^{o}-এর কম হলে তাকে তির্যক স্খলন চ্যুতি নাম দেওয়া হয়। এরাও শিলাস্তরের ভঙ্গির উপর নির্ভরশীল নয় (চিত্র : 7.5.1Ac)।

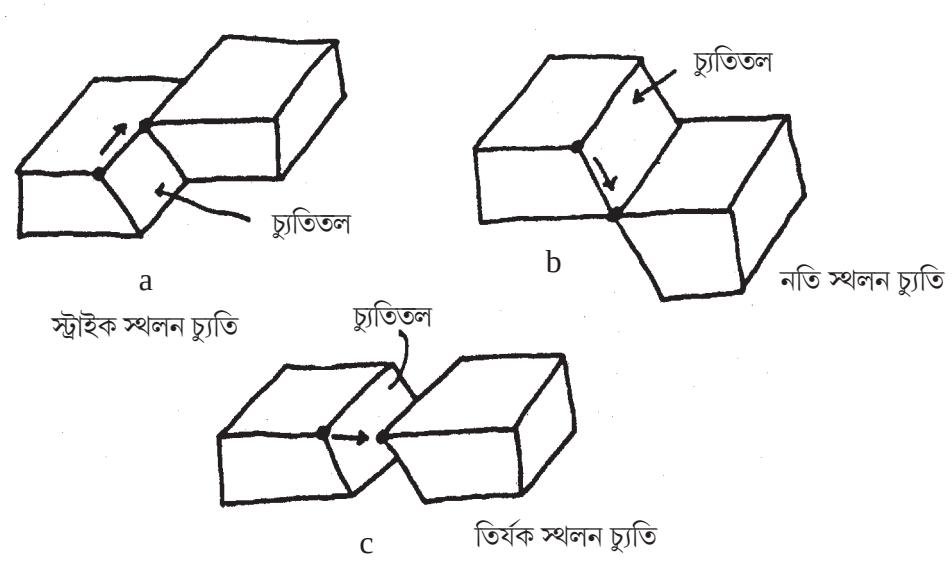

চিত্র 7.5.1 A

(B) চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সাথে শিলাস্তরের স্ট্রাইকের কোণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক ও শিলাস্তরের স্ট্রাইকের কোণের ভিত্তিতে তিন রকমের চ্যুতি দেখা যায়—

(1) স্ট্রাইক চ্যুতি

(2) ডিপ চ্যুতি

(3) তির্যক চ্যুতি

স্ট্রাইক চ্যুতিতে চ্যুতিতলের স্ট্রাইক ও শিলাস্তরের স্ট্রাইক সমান্তরাল থাকে। ডিপ বা নতি চ্যুতিতে দুই স্ট্রাইকের মধ্যে কোণ হয় 90° এবং তির্যক চ্যুতিতে দুই স্ট্রাইকের মধ্যে কোণ 10° থেকে 80°-র মধ্যে থাকে (চিত্র : 7.5.1B : a, b, c)।

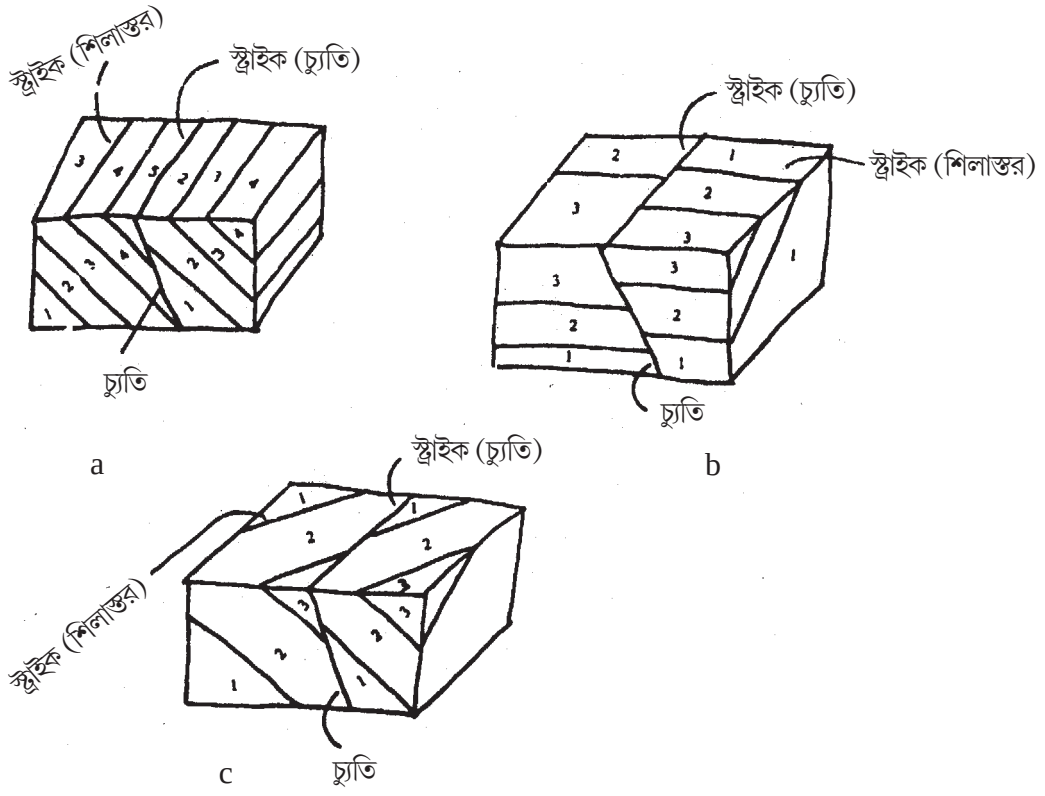

চিত্র 7.5.1 B

(C) চ্যুতিতলের সাথে বলির অক্ষতলের কৌণিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

এই শ্রেণীতেও তিন রকমের চ্যুতি দেখা যায়—

1. অনুদৈর্ঘ্য চ্যুতি

2. প্রস্থ চ্যুতি

3. তির্যক চ্যুতি

প্রথম ধরনের চ্যুতিতে চ্যুতিতল ও বলির অক্ষতল সমান্তরাল থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুই তলের মধ্যে কোণ হয় 90° এবং তৃতীয় শ্রেণীতে দুই তলের মধ্যে কোণ হয় 45°-র কাছাকাছি। তৃতীয় শ্রেণীর চ্যুতি সাধারণত যুগ্ম হয় (চিত্র : 7.5.1C : a, b, c)।

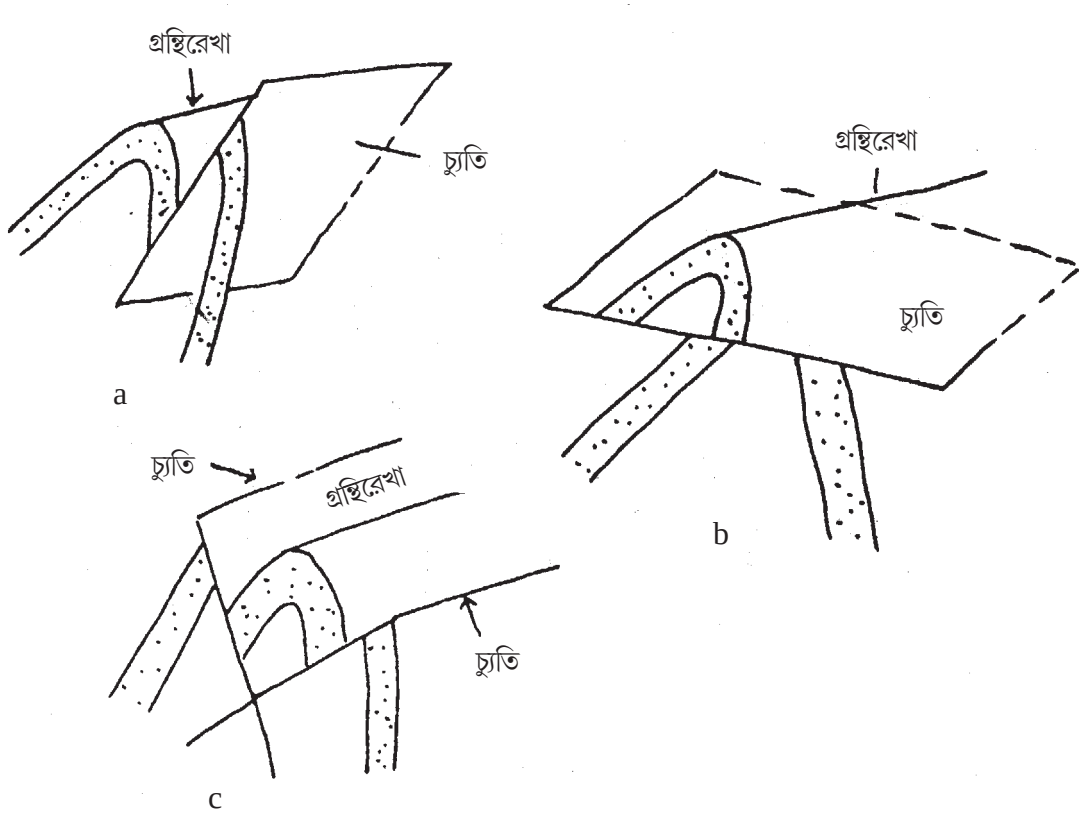

চিত্র 7.5.1 C

(D) চ্যুতি সমষ্টির জ্যামিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

এই ভিত্তিতে তিন ধরনের চ্যুতি পরিলক্ষিত হয়—

(1) সমান্তরাল চ্যুতি

(2) অরীয় চ্যুতি

(3) আঁনেশেলোঁ চ্যুতি

চিত্রে এই তিন রকমের চ্যুতিই দেখানো হল (চিত্র : 7.5.1D : a, b, c)।

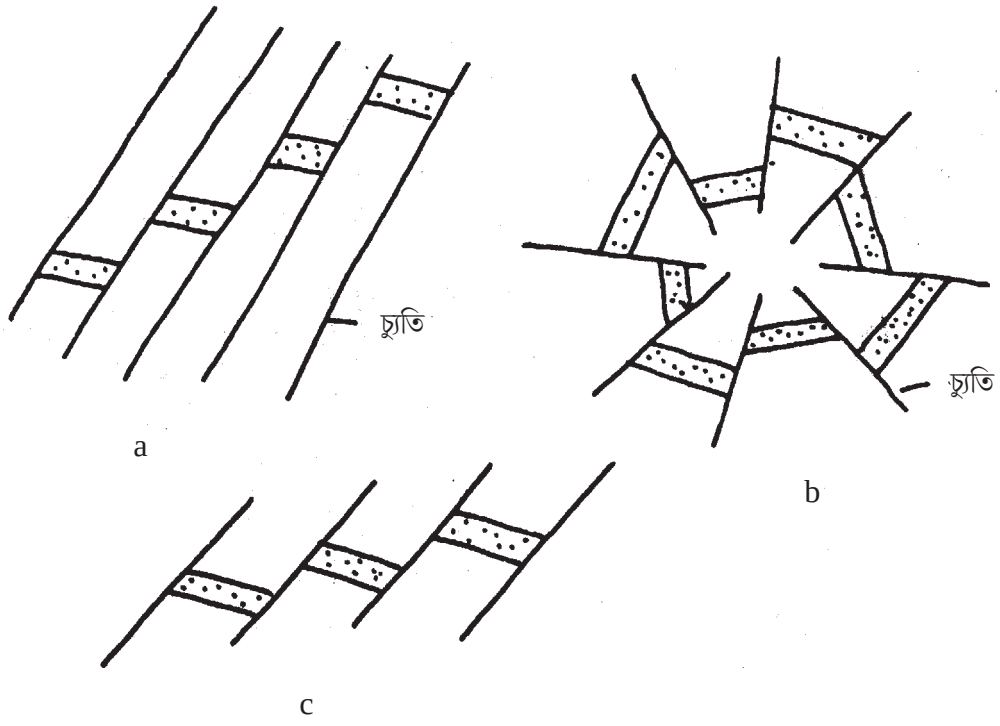

চিত্র 7.5.1 D

(E) অধোস্তূপ ও ঊর্ধ্বস্তূপের পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

এই ভিত্তিতে দু'ধরনের চ্যুতি দেখা যায়—

1. নর্ম্যাল চ্যুতি বা গ্র্যাভিটি চ্যুতি
2. রিভার্স চ্যুতি বা থ্রাস্ট চ্যুতি

প্রথম ধরনের চ্যুতিতে অধোস্তূপের পাথর ঊর্ধ্বস্তূপের পাথরের তুলনায় চ্যুতি বরাবর উপরে থাকে আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ অধোস্তূপের পাথর নিচে থাকে (চিত্র : 7.5.1E : a, b)।

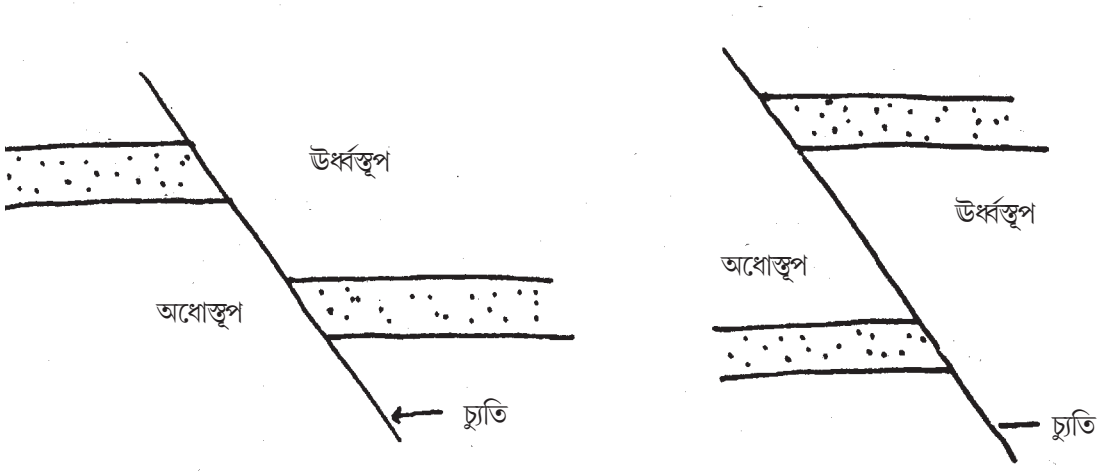

চিত্র 7.5.1 E

7.5.2 শিলাস্তরে চ্যুতির অবস্থিতির লক্ষণ

শিলাস্তরে চ্যুতির উপস্থিতি নানাভাবে প্রমাণ করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলি হল—

(A) শিলাস্তরে বিচ্ছেদ : চ্যুতির ফলে শিলাস্তরের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিচ্ছেদই চ্যুতির উপস্থিতির অন্যতম প্রধান প্রমাণ। শিলাস্তরের বিচ্ছেদের প্রকাশ সবসময় চ্যুতি বরাবর একই শিলাস্তরের সরে যাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনও যদি দেখা যায় যে, ভূতাত্ত্বিক বিচারে কোনো পুরনো শিলাস্তূপ কোন সমতল বরাবর নবীন শিলাস্তূপের উপরে উঠে এসেছে, তবে ঐ সমতলকে চ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র : 7.5.2a)। অনেক সময় আবার গাঠনিক দিক দিয়ে জটিল (অর্থাৎ চ্যুতি, বলি ইত্যাদি যুক্ত) পাথর একটি সমতল বরাবর কোন সরল পাথরের উপরে থাকলে ঐ তলকেও চ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত করা চলে (চিত্র : 7.5.2b)।

(B) ভূ-বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে কোন সমতলের দু'পাশে একই স্তর বা স্তর সমষ্টির পুনরাবৃত্তি চ্যুতির অবস্থান ইঙ্গিত করে—এসব ক্ষেত্রে ঐ সমতলটিই চ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত হয় (চিত্র : 7.5.2c)। আবার অনেক সময় কোন সমতলের দু'পাশে এক বা একাধিক স্তরের স্তর পরম্পরা বাদ পড়তে দেখা যায়। তখনও ঐ সমতলকে চ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়। (চিত্র : 7.5.2d)।

(C) কোন সমতল বা সমতলীয় অঞ্চল বরাবর মাইলোনাইট্ নামক পাথরের উপস্থিতিও অনেক সময় চ্যুতির অবস্থান ইঙ্গিত করে। মাইলোনাইট্ আর কিছুই নয়, এক ধরনের ভাঙা পাথর যার মধ্যে শিলার ভাঙ্গা টুকরোগুলো প্রলম্বিত হয় এবং সমান্তরালভাবে অবস্থিত হয়ে শিলা সম্ভেদের সৃষ্টি করে।

(D) কোন সমতল বা সমতলীয় অঞ্চল বরাবর ব্রেকসিয়া নামক পাথরের উপস্থিতিও চ্যুতির অবস্থান ইঙ্গিত করে। চ্যুতির ফলে চ্যুতি বরাবর পাথর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই টুকরোগুলি পরে চাপে ও তাপে পাথরে পরিবর্তিত হয়। এই পাথরকেই ব্রেকসিয়া বলে। (চিত্র : 7.5.2e)।

(E) পাথরের মধ্যে কোন সমতল বরাবর যদি সমান্তরাল মসৃণ আঁচড় কাটা দেখা যায়, তবে তা চ্যুতির অবস্থানের ইঙ্গিতবাহী। এই আঁচড় চ্যুতির অধোস্তূপ ও ঊর্ধ্বস্তূপের ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট হয় (চিত্র : 7.5.2f)।

(F) ভূ-বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে কোনো সমতল বা সমতলীয় অঞ্চল বরাবর বিশেষ কোনো মণিকের উপস্থিতিও চ্যুতির অবস্থান ইঙ্গিত করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাক্-ক্যাম্বিয়ান যুগের পাথরে অনেক সময়ই একটি সমতল বরাবর লোহাঘটিত মণিকের উপস্থিতি থেকে চ্যুতির অবস্থান ইঙ্গিত করা হয়েছে।

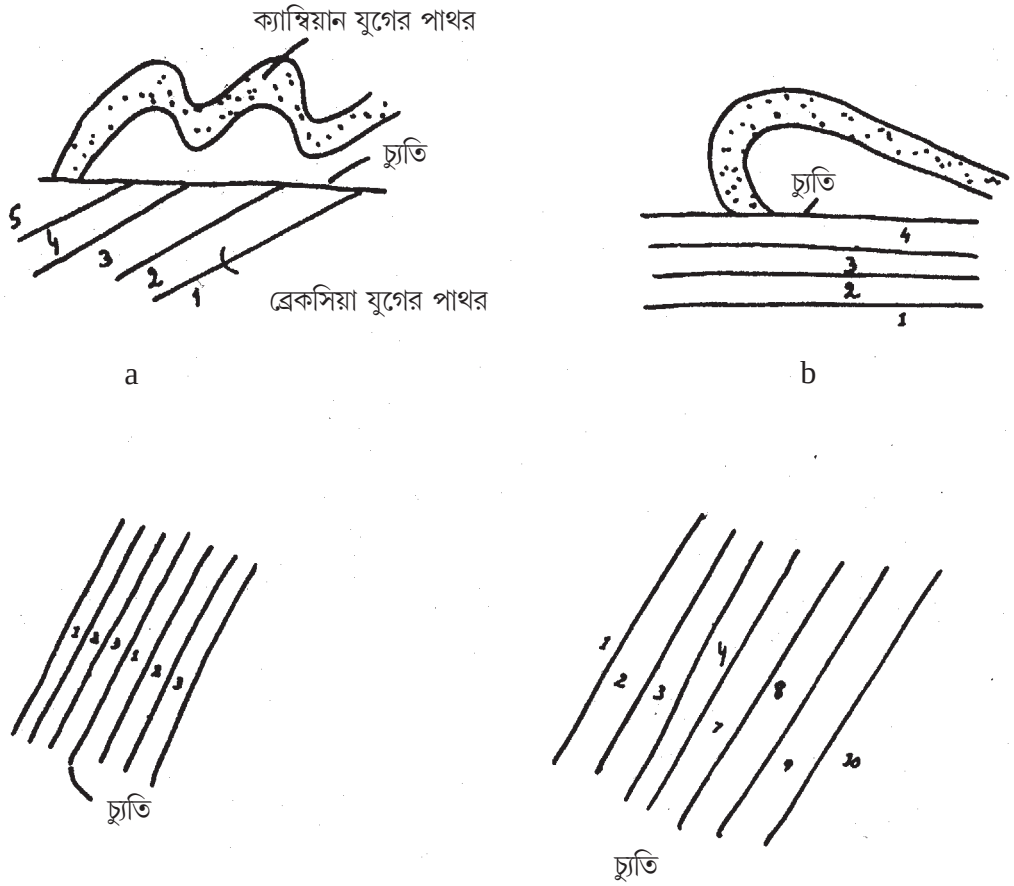
ক্যাম্বিয়ান যুগের পাথর
চ্যুতি
5
4
3
2
1
ব্রেকসিয়া যুগের পাথর
a
চ্যুতি
4
3
2
1
b
চ্যুতি
c
1
2
3
4
7
8
9
10
চ্যুতি
d
ব্রেকসিয়া
e
আঁচড়
চ্যুতি
f

চিত্র 7.5.2

7.6 ভূমিরূপের উপর বলি ও চ্যুতির প্রভাব

পৃথিবীর উপরিতলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় উপরিতল। এই দুই উপরিতলের কোনটিই শুধু সমতল দ্বারা গঠিত নয়। দুই উপরিতলেই উচ্চ পর্বতমালা, গভীর গিরিখাত, মালভূমি উপত্যকা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। পর্বত, মালভূমি, উপত্যকা, খাদ প্রভৃতি ভূমিরূপের উপর অনেক ক্ষেত্রেই বলি ও চ্যুতির প্রভাব দেখা যায়।

মহাসাগরীয় ভূমিরূপের কথা প্লেট টেক্টনিক্স তত্ত্বে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আমরা শুধু মহাদেশীয় ভূমিরূপের উপর বলি ও চ্যুতির প্রভাবের কথা আলোচনা করব। এই প্রভাবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই গ্রস্থ উপত্যকার কথা বলতে হয়। গ্রস্ত উপত্যকায় ভূত্বকের একটি অংশ, যার দৈর্ঘ্য প্রস্থের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি, অবনমিত হয়। ঐ অবনমিত অংশের দু'পাশে থাকে দুটি চ্যুতি (চিত্র : 7.6A)। এরাই ভূত্বককে অবনমিত করে। হরস্ট নামক আর একধরনের ভূমিরূপ দেখা যায় যেখানে চ্যুতি দু'টির মধ্যবর্তী ভূত্বক উত্থিত হয় এবং গ্রস্ত উপত্যকার বিপরীত ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। দুই বা ততোধিক গ্রস্থ উপত্যকা পাশাপাশি থাকলে দুটি গ্রস্থ উপত্যকার মধ্যবর্তী অংশ হরস্টের আকার নেয় (চিত্র : 7.6B)। গ্রস্ত উপত্যকার অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। জার্মানীর রাইন গ্রস্ত উপত্যকা একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। ভারতেও অনেক গ্রস্থ উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। নর্মদা ও গোদাবরী নদী যে খাতে প্রবাহিত, তারা গ্রস্ত উপত্যকা দ্বারা সৃষ্ট।

ভূমিরূপের উপর বলিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। কোথাও পরপর অ্যান্টিফর্ম ও সিন্ফর্ম থাকলে অ্যান্টিফর্ম অঞ্চলে পাথরের ক্ষয় বেশি হয় এবং এই ক্ষয়িত পাথর সিনফর্ম অঞ্চলে জমতে থাকে। অ্যান্টিফর্ম অঞ্চলে ক্ষয় কেন বেশি হয় তার নানা শিলা বলবিদ্যাগত কারণ আছে। যাই হোক, এইভাবে ক্ষয় ও জমা বহু কোটি বছর ধরে চলতে থাকলে সিন্ফর্ম অঞ্চলটি উঁচু পাহাড়ের আকার নেয় এবং অ্যান্টিফর্ম অঞ্চলটি সমতল বা খাদের চেহারা নেয় (চিত্র : 7.6C)। এই ধরনের পাহাড় সমতল বা খাদ পৃথিবীর অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে এর একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায় বিহার ও ওড়িশার লৌহ আকর সমৃদ্ধ অঞ্চলে। ঐখানে অবস্থিত বোনাই রেঞ্জ যা প্রধানত লৌহ আকর সংস্থানের জন্য বিখ্যাত, গাঠনিক দিকের বিচারে তা একটি সিন্ফর্ম। রাজস্থানের আরাবল্লি পর্বতমালাও একটি বিশাল আকারের সিন্ফর্ম বলে অনেকে অনুমান করেন।

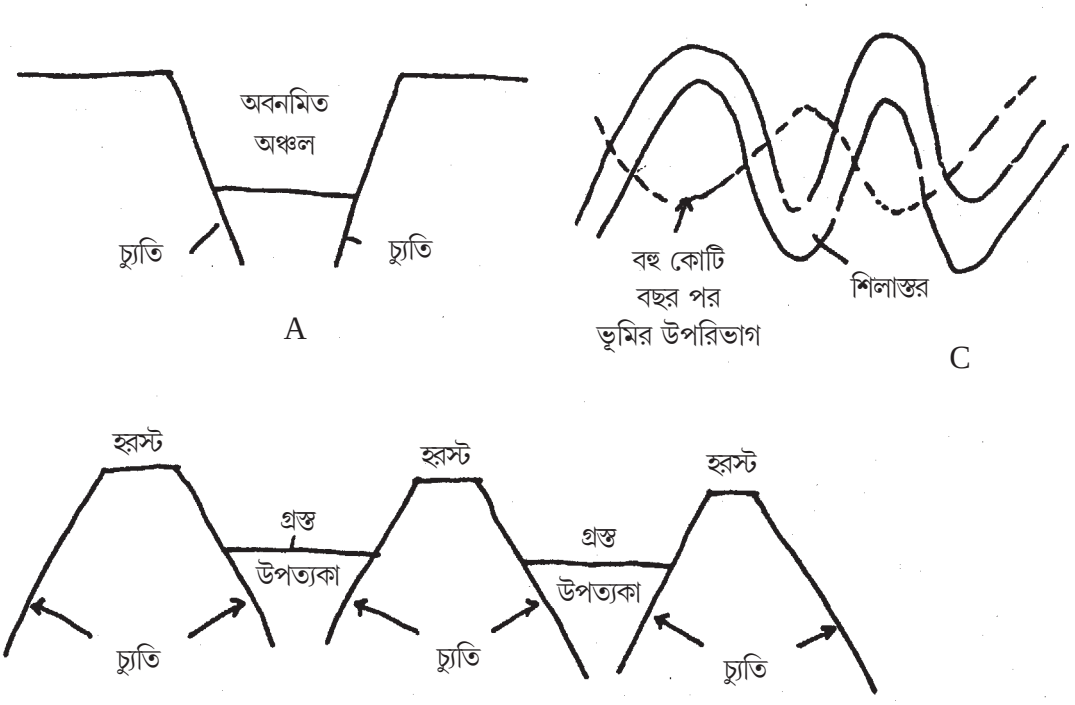
অবনমিত
অঞ্চল
চ্যুতি
চ্যুতি
A
বহু কোটি
বছর পর
ভূমির উপরিভাগ
শিলাস্তর
C
হর্স্ট
হর্স্ট
হর্স্ট
গ্রস্ত
উপত্যকা
গ্রস্ত
উপত্যকা
চ্যুতি
চ্যুতি
চ্যুতি
B

চিত্র 7.6

7.7 সারাংশ

বলি ও চ্যুতি পাথর ও শিলাস্তরের দু'টি গাঠনিক উপাদান। বলি বলতে আমরা শিলাস্তরের ভাঁজ বুঝি। বলি অ্যান্টিফর্ম, সিন্‌ফর্ম, নিউট্রাল, আনুভূমিক, উল্লম্ব ইত্যাদি নানা ধরনের হয়। চ্যুতি বলতে আমরা কোন ফাটল বরাবর শিলাস্তরের স্থানান্তরণ বুঝি। চ্যুতিরও নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। একদিকে যেমন আছে স্ট্রাইক, ডিপ ও তির্যক চ্যুতি—অন্যদিকে তেমনই আছে স্ট্রাইক স্লিপ, ডিপ স্লিপ ও তির্যক স্লিপ চ্যুতি। নর্ম্যাল ও রিভার্স চ্যুতিও চ্যুতির একটি বিশেষ শ্রেণী গঠন করে। পাথর ও শিলাস্তরের চ্যুতির অবস্থান জানার নানা লক্ষণ আছে। কিন্তু কোন তল বরাবর পাথরের বিস্থাপনই চ্যুতি চেনার সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

বলি ও চ্যুতি ভূমিরূপকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে। গ্রস্ত উপত্যকা, হরস্ট প্রভৃতি ভূমিরূপ চ্যুতির প্রভাবে সৃষ্টি হয়। পাথরে বলির প্রভাবে কোথাও কোথাও পাহাড় জন্ম নেয়। গ্রস্ত উপত্যকা, হরস্ট ও বলি জনিত পাহাড়—সবেরই উদাহরণ ভারতে দেখতে পাওয়া যায়।

7.8 প্রশ্নাবলী

(A) বলি কি? চিত্র-সহ বলির বিভিন্ন গাঠনিক উপাদানের বর্ণনা দিন।

(B) গাঠনিক উপাদানের ভঙ্গির ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ করুন এবং চিত্র-সহ তা ব্যাখ্যা করুন।

(c) বলি পৃষ্ঠের আকৃতির ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ করুন এবং চিত্র-সহ তা ব্যাখ্যা করুন।

(D) চ্যুতি কি? চিত্র-সহ চ্যুতির গাঠনিক উপাদানের বর্ণনা দিন।

(E) নেট স্লিপের ভঙ্গির ভিত্তিতে চ্যুতির শ্রেণীবিভাগ করুন এবং চিত্র-সহ বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণনা দিন।

(F) চ্যুতিতলের স্ট্রাইক ও শিলাস্তরের স্ট্রাইকের কৌণিক সম্পর্কের ভিত্তিতে চ্যুতির শ্রেণীবিভাগ করুন ও চিত্র-সহ ব্যাখ্য করুন।

(G) চ্যুতি সমষ্টির জ্যামিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে চ্যুতির শ্রেণীবিভাগ করুন। চিত্রের মাধ্যমে সমান্তরাল ও অরীয় চ্যুতি দেখান।

(H) গ্রস্ত উপত্যকা ও হরস্ট কি? তাদের উৎপত্তিতে চ্যুতির প্রভাব কতখানি? ভারতের দুটি গ্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ দিন।

(I) ভূমিরূপের উপর বলির প্রভাব কি? চিত্র-সহ ব্যাখ্যা করুন।

7.9 উত্তর সংকেত

(A) উত্তরের জন্য 7.3 অংশ দেখুন।

(B) উত্তরের জন্য 7.4.1 অংশ দেখুন।

(C) উত্তরের জন্য 7.4.2 অংশ দেখুন।

(D) উত্তরের জন্য 7.5. অংশ দেখুন।

(E) উত্তরের জন্য 7.5.1A অংশ দেখুন।

(F) উত্তরের জন্য 7.5.1B অংশ দেখুন।

(G) উত্তরের জন্য 7.5.1D অংশ দেখুন।

(H) উত্তরের জন্য 7.6 অংশ দেখুন।

(I) উত্তরের জন্য 7.6 অংশ দেখুন।

7.10 প্রতিশব্দ

Amplitude-বিস্তার

Bed-শিলাস্তর

Bore hole-ভূছিদ্র

Cross section-প্রস্থচ্ছেদ

Dip-নতি

Graben-গ্রস্ত উপত্যকা

Horst-হরস্ট

Heave-হিভ্

Plunge-প্লাঞ্জ

Strike-স্ট্রাইক বা আয়াম

Trend-ট্রেন্ড

Throw-থ্রো

Wavelength-তরঙ্গদৈর্ঘ্য

Fold-বলি

Hinge-গ্রন্থিবিন্দু

Hinge line-গ্রন্থিরেখা

Hinge zone-গ্রন্থিঅঞ্চল/বলয়

Limb-বাহু

Axial plane-অক্ষতল

Enveloping plane-আচ্ছাদন তল

Interlimb angle-আন্তর্বাহু কোণ

Antiform-অ্যান্টিফর্ম বা ঊর্ধ্বভঙ্গ

Synform-সিন্‌ফর্ম বা অধোভঙ্গ

Neutral-নিউট্রাল

Horizontal-আনুভূমিক

Vertical-উল্লম্ব

Plunging-অবনত

Recumbent-শায়িত

Upright-খাড়াই

Inclined-আনত

Reclined-প্রণত

Overtuned-বিপর্যস্ত

Cylindrical-স্তম্ভাকার

Non cylindrical-অস্তম্ভাকার

Conical-শঙ্কু আকার

Gentle-মৃদু

Open-মুক্ত

Close-বন্ধ

Tight-সংকীর্ণ

Isoclinial-সমভঙ্গ

Symmetric-প্রতিসম

Asymmetric-অপ্রতিসম

Chevron-তীক্ষ্ণ

Fault-চ্যুতি

Strike slip-স্ট্রাইক স্খলন

Dip slip-নতি স্খলন

Oblique slip-তির্যক স্খলন

Oblique-তির্যক

Longitudinal-অনুদৈর্ঘ্য

Transverse-অনুপ্রস্থ

Conjugate-তির্যক

Parallel-সমান্তরাল

Radial-অরীয়

Enchelon-আঁনেশেলোঁ

Normal or Gravity-নর্ম্যাল বা গ্র্যাভিটি

Reverse or Thrust-রিভার্স বা থ্রাস্ট

7.11 নির্বাচক সহায়ক পুস্তক

(ক) সুবীর কুমার ঘোষ; গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, 1975

(খ) Billings, M.P. Structural Geology, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 1986.

NOTES

NOTES